হেমচন্দ্র বাগচীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

হেমচন্দ্র বাগচীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

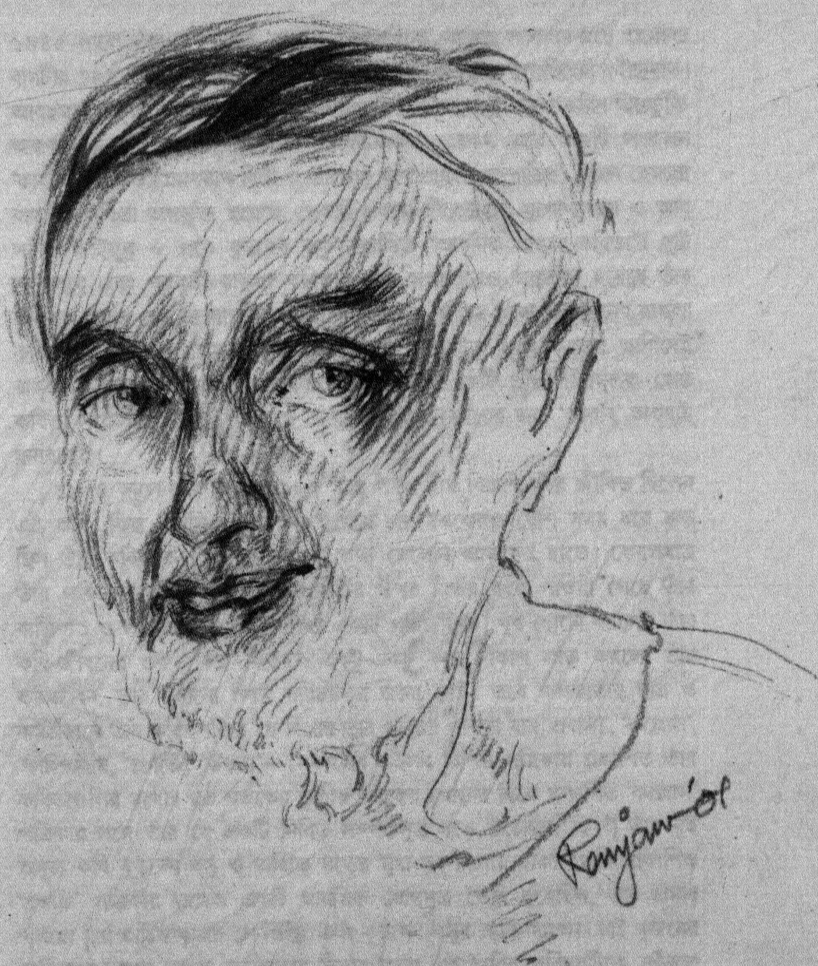
সুশান্ত বসু
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা ১২


Ranjan '01

১৯৪৫ সালে তাঁর সম্পাদিত 'বাঙলা-কাব্যপরিচয়' নামের সংকলন-গ্রন্থে হেমচন্দ্র বাগচীর ১৯২৮ সালে লেখা 'দুরাশা' নামক কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আবহমান বাঙলা কবিতার ধারাবাহী সংকলনে সেদিনের এই তরুণ কবির অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই একটি স্মরণীয় স্বীকৃতি। পরবর্তীকালে এরকম আর একটি সংকলন 'কাব্যবিতান'-এও (প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত) যেমন হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি প্রথমে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব ও পরে বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'আধুনিক বাঙলা-কবিতা'র দুটি সংকলনে এবং পরবর্তী বাঙলা কবিতার নানা সংকলনেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর কবিতা। তবুও হেমচন্দ্র বাগচীর সামগ্রিক কবিতার পরিচয় আজকের দিনের বাঙ্‌লা কবিতার পাঠকদের তেমন জানা নেই। সেই অভাবটুকু পূরণ করবার তাগিদেই বাঙ্‌লা কবিতার এই স্মরণীয় কবির কবিতাবলীর একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে উদ্যোগী হয়েছে 'ভারবি'। এই উদ্যোগের জন্য 'ভারবি' অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

১৯০৪ সালে তাঁর জন্ম। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিরাশি বছর জীবিত ছিলেন এই কবি। কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে স্তব্ধ ছিল তাঁর কবিজীবন। বিশেষ কোনো তথ্য মেলেনি আমাদের হাতে। কেবলমাত্র তাঁর পরিজনবর্গের দেওয়া জীবনপঞ্জিটির উপর নির্ভর করে পাওয়া গেছে তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচায়িকা। খুব ছোটো বয়সেই তাঁর কবি-জীবনের শুরু। কিন্তু কিভাবে একটু-একটু করে বিকাশ লাভ করলো তাঁর কবিজীবন, তার কোনো স্পষ্ট পরিচয়সূত্র জানা নেই। তবে কলকাতার ছাত্র ও কর্মজীবনে তাঁর কবিত্বশক্তির যে বিস্তার তার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রবাসী', 'কল্লোল', 'কালিকলম, 'প্রগতি', 'উত্তরা'—সেকালের এইসব বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে। গত শতকের তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যে একটি নিবিড় সম্পর্কসূত্র গড়ে উঠেছিল, কিংবা তাঁর দুই অনুজ কবি বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের যুগ্ম-সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকার সঙ্গেও একটি মানসিক যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতি-সাক্ষ্যে। এই দুজনের স্মৃতিকথার মধ্য থেকে সেদিনকার স্বভাব-স্বতন্ত্র এই কবির পরিচয়টিকে জানতে পারি আমরা।

অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল-যুগ'-এ লিখেছেন, 'হেম বাগচীর সঙ্গে আলাপ হয় বলাই সিঙ্গি লেনের মেসে। জীবনানন্দের বেলায় যেমন, ওর বেলায়ও ওর ঠিকানা

খুঁজে ওকে বের করি। নতুন লেখক বা শিল্পী খুঁজে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে দারুণ উৎসাহ, বিশেষত সে যদি মর্মজ্ঞ হয়। হেম হচ্ছে তেমন কবি যার সান্নিধ্যে এসে বসলে মনে হয় নিবিড়-স্নিগ্ধ বৃক্ষ-ছায়াতলে এসে বসেছি। সবল বিশাল চেহারা, চোখ-দুটি দীর্ঘ ও শীতল—স্বপ্নময়। তীব্রতার চেয়ে প্রশান্তি, গাঢ়তার চেয়ে গভীরতার দিকে দৃষ্টি বেশি। প্রথম যখন ওকে পাই তখন ওর জীবনে সদ্য মাতৃবিয়োগের ছায়া পড়েছে—সেই ছায়ায় ওর জীবনের সমস্ত ভঙ্গিটি কমনীয়। সেই লাবণ্যটি সমস্ত জীবনে সে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লালন করেছে, তাই তার কবিতায় এই শুচিতা ও স্নিগ্ধতা। হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থেকে হেম যখন 'ল' পড়ে তখন প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় চারতলার ওপরে তার ঘরে আড্ডা দিতে গিয়েছি, দ্বৈত কলকূজন ছেড়ে পরে চলে এসেছি বহুস্বননের 'কল্লোলে'। কোনো উদ্দামতায় হেম নেই, সে আছে নির্মল স্থৈর্যে, কোনো তর্কতীক্ষ্ণতায় সে নেই, সে আছে উত্তপ্ত উপলব্ধিতে। নিকষকষিত সোনার মতোই সে মহার্ঘ।' (কল্লোল যুগ, পৃষ্ঠা ২০৯-১০, পঞ্চম প্রকাশ ১৩৭২)।

অচিন্ত্যকুমারের এই মরমী স্মৃতিচারণ ও হেমচন্দ্রের অন্তর্মুখ কবিস্বভাবের এই নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনা থেকে মানুষ হেমচন্দ্র ও কবি হেমচন্দ্র বাগচীর অন্তরঙ্গ পরিচয়টি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি তাঁর আর-এক মর্মগ্রাহী বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় ধরা পড়েছে তাঁর কবিসত্তার রূপটি। বুদ্ধদেব লিখছেন, 'এই প্রসঙ্গে অন্য-একজনকে আমার মনে পড়ছে—অন্য-এক কবি, তার পরিচয় আজ 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'র কয়েকটি পাতায় আবদ্ধ হয়ে আছে। 'কল্লোল' থেকেই আমার বন্ধু ছিল হেম বাগচী। 'প্রগতি'-র সময়ে তার সঙ্গে আমার চিঠি চলতো নিয়মিত। ...চালচলনে আমাদের মতো নয় হেম, উড়ুক্কুপনা তার আদৌ আসে না। তার কবিতায় সুষ্ঠুতা থাকলেও ভাবে-ভঙ্গিতে চমকপ্রদ কিছু নেই, তার কবিতার বই 'দীপান্বিতা'র নামকরণটিও অনাধুনিক। সে মানুষ হয়েছে পুরনো ধরনে আর কলেজে পড়েছে সংস্কৃত; তার বাবা তাকে অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আমার মনের প্রকৃতি ঠিক মেলে না, কিন্তু তবু—অথবা সেইজন্যেই—আমার বিশেষ-একটু ভালো লাগে তাকে, ভালো লাগে তার শান্ত হাসি ও স্নিগ্ধ আলাপ, অনুভব করি তার মধ্যে একটি নির্মলতা যা আমরা হারিয়েছি। তার দেশ নদিয়া জেলায়, জন্ম বারেন্দ্র-বংশে, কিন্তু বারেন্দ্রসুলভ তীক্ষ্ণতা সে প্রাপ্ত হয়নি—এজন্যেও তার সংসর্গে আমি ভিন্ন-ধরনের একটি আরাম পাই। সে কথা বলে নরম গলায় থেমে-থেমে, তর্ক করে না; কারো বিরুদ্ধে কিছু বলে না, কাউকে বা কোনোকিছুকে নির্দোষভাবেও ঠাট্টা করে না—কোনো বিষয়ে প্রবল মতামত আমি তার মুখে শুনিনি, তার লেখারও কোনো নিন্দুক বা সমালোচক নেই। আমাদের মধ্যে নির্দ্বন্দ্ব লেখক সে-ই একমাত্র' (আমার যৌবন, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫, এপ্রিল ১৯৭৬)।

দীর্ঘ এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে কবি হেমচন্দ্র বাগচীর যে পরিচয়টি ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে থেকেই আমরা বুঝে নিই তার সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতার চরিত্রটিকে। এর পর বুদ্ধদেব তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর অসুস্থ স্ত্রী এবং অনেকগুলি সন্তানের পিতৃদায়ভারে

প্রপীড়িত, অর্থকষ্টে জর্জরিত ভবানীপুর-পদ্মপুকুর ইন্সটিটিউশনের আর্ত এক মন ভেঙে-যাওয়া কবি হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়েছেন আমাদের। সেই ভগ্নহৃদয় কবি হেমচন্দ্রের ধূসর উত্তরজীবনের আর-একটি টুকরো স্মৃতিচিত্রণও ধরা আছে বুদ্ধদেবের 'আমার যৌবন'-এ। তার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া এক কবি হেমচন্দ্রের অন্য-একটি মানসিক ও মানবিক পরিচয়টুকু জানতে পাই আমরা।

২.

এই যে কবি হেমচন্দ্র বাগচী, তিনি যে তাঁর বছর-কুড়ির অস্থির সাহিত্য-জীবনে লিখেছিলেন বেশ-কিছু কবিতা, যার অধিকাংশই নানা সময়ে ছাপা হয়েছিল 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কালি-কলম', 'উত্তরা', 'প্রবাসী', 'উপাসনা', 'নবশক্তি', 'কেতকী', 'পঞ্চপুষ্প', 'পরিচয়', 'দেশ', 'বঙ্গশ্রী'—এমনি-সব পত্র-পত্রিকায়, যার মধ্যে বেশ-কিছু কবিতাই সংকলিত আছে তাঁর 'দীপান্বিতা', 'তীর্থপথে', এবং 'মানসবিরহ' নামক তিনটি কাব্যগ্রন্থে—এ-সব খবর যেমন আজকের দিনের কাব্য-পাঠকদের অজানা, তেমনি তিনি যে লিখেছিলেন উপন্যাস কিংবা ছোটোদের জন্য বেশ-কিছু গল্প, হেমচন্দ্রের সে-পরিচয়ও আজকে হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির অতলে। নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো তাঁর কবিতা এবং অন্যান্য লেখাগুলি উদ্ধার করে উত্তরকালে যদি কোনো আগ্রহীজন একটি নির্ভরযোগ্য 'হেমচন্দ্র বাগচী-রচনাসমগ্র' প্রকাশ করেন তাহলে অবশ্যই তাঁর সাহিত্যিক সত্তার একটি পুরো চেহারা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে পারে তাঁর পাঠকদের কাছে। আপাতত আমরা তাঁর প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য নানা সূত্র থেকে সংকলিত তাঁর অগ্রন্থিত কিছু কবিতার ভিত্তিতে চিনতে চেষ্টা করবো এই কবির কবি-স্বভাবটিকে।

৩.

অবশ্যই কল্লোলের উচ্চকিত এবং 'কলস্বনিত' আধুনিকতার সহযাত্রী ছিলেন না হেমচন্দ্র বাগচী। সাহিত্যের চিরকালের বিষয় ঈশ্বর, পৃথিবী এবং ভালোবাসা-সম্পর্কে কোনো 'ভাঙার গান' তিনি রচনা করেননি। ঈশ্বরকে নিয়ে কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসু ভাবনায় উদ্দীপ্ত হননি তিনি। কিন্তু এই পৃথিবীর প্রকৃতি ও মানুষ নানাভাবে উদ্বেজিত করেছে নিভৃতচারী এই কবির কল্পনাকে। আর ভালোবাসার অবিরল উচ্চারণ নানাভাবে, নানা বিভঙ্গে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথকে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করে আমাদের বাঙ্‌লা কবিতায় যে নব্য আধুনিকতার নতুন যাত্রা সেখানে হেমচন্দ্রের কবিতায় তাঁর প্রতি প্রাণিপাত যেমন গভীর তেমনি পরিপ্রশ্নের কোনো প্রতিবাদী উচ্চারণ যে নেই তা তাঁর 'বৈজয়ন্তী', 'রবীন্দ্রজয়ন্তী', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। তাঁর কবিতাগুলির ভিতর থেকে আসলে আমরা খুঁজে পাই জন্ম-রোমান্টিক, আলাদা ধরনের 'রসতীর্থ পথের পথিক' এক কবিকে।

৪.

স্বপ্নের ফেরিওলা সুন্দরের ধ্যানব্রতী মোহিতলাল মজুমদারকে উৎসর্গ করেছিলেন কবি তাঁর প্রথম কবিতার বই 'দীপান্বিতা'। তাঁরই মতো প্রতিদিনের 'দাসজীবনের'

মাঝখানে বসে সুন্দরের অনুধ্যানই হেমচন্দ্রের কবিব্রত। তারই প্রেরণায় নিসর্গের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য কেমন করে উজ্জীবিত করে কবিকে, তার পরিচয় পাবেন পাঠক তাঁর 'আষাঢ়-শেষে' কিংবা 'শুক্লা-একাদশী'র মতো কবিতায়। অন্যদিকে তাঁর কবিতায় 'সন্ধ্যামণি', 'মাধবী' কিংবা শেফালির মতো ফুলকে ঘিরে কবির সুন্দরের অনুভব ধরা পড়ে এক নম্রবাক্ উচ্চারণে। এই কবির কাব্যভুবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে প্রেম। সে প্রেম কখনও-বা লৌকিক অনুভবে রাগতপ্ত, আবার কখনও বা অধরা মাধুরীকে ঘিরে কবির এক আর্ত অথচ শান্ত উচ্চারণ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে যে কবি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন তার পরিচয় মিলবে তাঁর এই সংকলনের 'লতাময়ী উর্বশী', 'তিলোত্তমা', 'রমা', 'লীলাকমল', 'মৈত্রেয়ী', কিংবা 'যৌবন-ভিক্ষা'-র মতো কবিতাগুলিতে। রাবীন্দ্রিক কাব্যবৃত্তের নানা অনুষঙ্গ যেমন তাঁর কবিতার অঙ্গরাগ জুগিয়েছে, তেমনি মোহিতলালের ধ্রুপদী বাক্‌ভঙ্গির নানা প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবও যে কিভাবে তাঁর সৃজনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তারও নানা চলচিহ্ন খুঁজে পাবেন পাঠক এই কবির নানা কবিতার বুনোট আর গড়নের মধ্যে। যে 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী' সেই নিঃসঙ্গ বেদনায় কবি খুঁজে ফিরেছেন তাঁর 'চিরসুন্দর'কে, মর্মের গভীরে শুনেছেন সৃষ্টির প্রেরণারূপিণী সেই 'বিশ্বনর্তকী'র নিত্য-ধ্বনিত নৃত্যের চলচ্ছন্দকে। আর তারই খোঁজে লিখেছেন তাঁর 'মানস-বিরহের' অনুসন্ধিৎসু স্তবকমালা। এরই পাশাপাশি চলতিকালের চারপাশের দিকে তাকিয়ে যখন চোখ পড়েছে আর মন জেগেছে তাঁর, তখন 'দিন-মজুরের ছেলে'-র দুঃখদীর্ণ জীবনের বেদনাময় কবিতা লিখেছেন তিনি, কিংবা সাগরমন্থন-সম্ভূতা 'রমা'-র কথা বলতে গিয়ে তাঁর মনে জেগেছে 'দারিদ্র্যের বিভীষিকা' আর 'আতুরের আর্ত হাহাকার' এবং 'লৌহবাহু নব-সভ্যতার/আস্ফালন-মন্থনের রক্ত মহোৎসব'এর কথা; কিংবা ওই রমারই করধৃতা ধান্যমঞ্জরীর স্মৃতিসূত্রে তাঁর 'ধান্যমঞ্জরী' কবিতায় তিনি লেখেন 'কমলার করপুটে ধান্যশীর্ষ নাহিকো কেবল/আছে তাঁর পদ্মহস্তে শ্রমিকের রক্তরাঙা ধন'—তখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও সময়-সচেতন আর-এক কবি হেমচন্দ্রকে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেলেও এই তথ্যবহ বাগ্মিতা কতখানি শিল্প-সার্থকতা লাভ করেছে সে-বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ থেকে যায়। আবার যখন তিনি 'মহত্তর ভারত'-এর স্বপ্ন-দেখার কিংবা 'নবীন মন্ত্রে'র পদ্যবন্ধ রচনা করেন, অথবা 'মৈত্রেয়ী'র কথা বলতে গিয়ে সমকালীন ভারতের নারীশক্তির মধ্যে তাঁর ধ্যানমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করার কথা বলেন, তখন এই স্বপ্নদর্শী কবির উচ্চকণ্ঠ সামাজিকতার পরিচয়টিই কিন্তু বড় হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে। এগুলি অবশ্যই 'শ্রেষ্ঠত্ব'-এর শিরোপা পাওয়ার যোগ্য নয়, কিন্তু তাঁর কবিমনের অন্য-একটি পরিচয়-মাত্রাকে তুলে ধরার জন্যই এই সংকলনে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিজের মতো করে অকপট সারল্যে হেমচন্দ্র লিখেছেন 'মাটি' ও মানুষের প্রতি নিবিড় মমতার কথা, লিখেছেন বাৎসল্য-বিধুর স্মৃতি-জাগানিয়া শিশু আর শৈশবের কবিতা, লিখেছেন 'ভবভূতি', 'শেলি' কিংবা 'শরৎ-প্রশান্ত'র মতো বন্দনামূলক কবিতা—

তাঁর মুদ্রিত তিনটি বই থেকে সংকলিত এই কবিতাগুলির মধ্যে পাঠক খুঁজে পাবেন সেই অজানা কবি হেমচন্দ্র বাগচীকে। একথা ঠিক যে, বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন, তাঁর কবিতায় 'সুষ্ঠুতা' থাকলেও ভাবে-ভঙ্গিতে চমকপ্রদ কিছু নেই—আসলে 'চমকপ্রদ' কিছু লিখতেই চাননি কবি। সে দায়ভার তো গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর সহযাত্রীরাই। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনতি-অতীত বাঙলা কবিতার নানা উত্তরাধিকারকে নিজের মতো করেই এক মরমী নির্মলতায় প্রকাশ করেছেন তিনি। সেখানেই এই গভীর ছন্দচেতন কবির কাব্যসিদ্ধির সুষ্ঠুতা। তবে একটা কথা ঠিক যে, ছন্দ-বিষয়ে যতখানি সচেতন কবি, শব্দসিদ্ধির ব্যাপারে কিন্তু ততখানি নয়। কবিতায় যে অনিবার্য শব্দটির জন্য থাকে একজন পরিশ্রমী কবির অতন্দ্র সাধনা, হেমচন্দ্রের কবিতায় মাঝেমাঝেই চোখে পড়ে তার ব্যতিক্রমী চিহ্ন। বড্ড বেশি পুরনো শব্দের আনুগত্য মেনেছেন তিনি—অনেক এলানো শিথিল শব্দ ভর করেছে তাঁর কবিতার শরীরে। ফলে বেশ-কিছু ক্ষেত্রেই কবিতার শিল্পিত সৌন্দর্য হয়তো খাটো হয়েছে কিছুটা। তবুও উত্তরঙ্গ এক সময়ের মাঝখানে বসে নব্য 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর এই কবি রচনা করেছিলেন তাঁর কবিতার নিজস্ব ভুবনটি। সেদিনকার আধুনিকদের অনেকেই প্রচলিত বাঙলা ছন্দরীতির আশ্রয়ে সাধু ভাষাভঙ্গি-নির্ভর যে বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে রচনা করেছিলেন তাঁদের কবিতার বিষয়গত আধুনিকতার নিজস্ব নির্মাণ ও সৃষ্টির জগতটি, তারই মাঝখানে বসে হেমচন্দ্রও ওই একই বাক্‌ভঙ্গিতে লিখে চলেছিলেন তাঁর কবিতার পর কবিতা—কখনও নমিত গীতলতায় আবার কখনও-বা গাঢ়বদ্ধ শব্দের ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে। কবি হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা পড়তে গিয়ে এ-কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার।

৫.

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আমার যৌবন'-এ হেমচন্দ্রের কলকাতা-বাসের শেষের দিককার প্রসঙ্গ-কথায় লিখেছেন, 'এই সময়েই, তার মন যখন ভাঙনের প্রান্তে, তখনই তার ঘূর্ণি-কৃষ্ণনগরের ঠিকানা থেকে হেম আমাকে পাঠিয়েছিল তার 'গীতিগুচ্ছ'—ছোটো ছোটো গদ্য-লিরিকের পর্যায় এবং আরও-কিছু গদ্য-কবিতা—আমার মতে সেগুলি তার শ্রেষ্ঠ রচনা, যার মধ্য দিয়ে নিজেকে সে অবিকলভাবে প্রকাশ করেছিলো, তার অচির-সমাপ্ত কবিজীবনে প্রথম এবং শেষবারের মতো!' (পৃ ৭৬-৭৭)। বাস্তবিকই আমাদের এই সংকলনে গৃহীত তাঁর সেই 'গীতিগুচ্ছ'-এর এবং বিষ্ণু দে-সম্পাদিত 'একালের কবিতা'-র 'মনগহনী'-শীর্ষক নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে হেমচন্দ্রের পল্লবিত কবিসত্তার যে অবগাঢ় সংহত শিল্পমূর্তিগুলির পরিচয় ফুটে উঠেছে, মুহূর্তকে অনন্ত-করে-তোলা ওই কবিতাগুলি কবি হেমচন্দ্রের অন্য আর-এক গভীর কবিসত্তাকে উন্মোচিত করে আমাদের সামনে। তাঁর পরিজনদের কাছ থেকে পাওয়া একটি জীর্ণ খাতার অনুলিপি থেকে কবির আরও কয়েকটি অগ্রন্থিত কবিতা আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি এই সংকলনে। আশা করি, কবি হেমচন্দ্রের মনটিকে চিনতে এবং চেনাতে সাহায্য করবে এই কবিতাগুলি। তাঁর প্রিয় নদী 'জলাঙ্গী'-কে নিয়ে স্মৃতি-কাতর একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন কবি, তাঁর আর-একটি উৎকৃষ্ট কবিতা 'যৌবন-

ভিক্ষা' এই দুটি কবিতার পাণ্ডুলিপির অস্পষ্টতার জন্য কিছু-কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত পাঠের বিষয়ে সংশয় রয়েছে। তবুও বিশিষ্ট মনটিকে চেনাতে আমরা ওই কবিতা-দুটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি এই সংকলনে। ইমেজিস্ট আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগণ্য ইংরেজ কবি রিচার্ড আলডিংটন ও কল্পকুহেলি-ঘেরা এক অচেনা জগতের স্বপ্নদর্শী কবি ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন কবি। এই সংকলন-ধৃত সেই অনুবাদগুলির মধ্য দিয়ে অনুবাদক হেমচন্দ্র বাগচীর অন্য আর-একটি পরিচয়ও এখানে খুঁজে পাবেন তাঁর আগ্রহী পাঠক।

৬.

নানা টানাপোড়েনের সুতোয় বোনা কবিতার আছে নানা রঙ আর নানা রূপ। কোনো কবির লেখা সব কবিতাই তো সমান সিদ্ধির দাবিপত্র নিয়ে দেখা দেয় না। কবিতার পাঠক তাঁর নিজের বিচার আর বিবেচনামতো তার মধ্য থেকে একজন কবিকে আবিষ্কার করেন তাঁর সিদ্ধি আর সীমাবদ্ধতার সবটুকু নিয়েই। সেই বিবেচনা থেকেই নির্বাচিত আমাদের এই হেমচন্দ্র বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সমকালের 'প্রবাসী' পত্রিকা তাঁর 'দীপান্বিতা'র সমালোচনায় লিখেছিল, 'হেমবাবুর কবিতাগুলির মধ্যে একটা শান্ত সমাহিত ভাব আছে। আজকালকার অতি প্রচলিত ঝঞ্ঝা, বিদ্রোহ - ইত্যাদির প্রভাব কবিকে স্পর্শ করে নাই। এই হিসাবে দীপান্বিতা নামটি সার্থক হইয়াছে। কবি যে জগতে বিচরণ করিয়াছেন তাহা আমাদেরই অতি-পরিচিত গৃহপ্রাঙ্গণ, আমাদের নদীমাতৃকা এই বাঙ্‌লাদেশ, ঝিল্লিমুখর নিস্তব্ধ গ্রাম, পরিচিত সেই হাট মাঠ বাট।' আর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'তীর্থপথে'-র সমালোচনায় সেকালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছিল, 'শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী সুপরিচিত কবি। তাঁহার সমস্ত কবিতার অন্তরালে একটি স্নিগ্ধ ভাব, শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের জন্য ব্যাকুল বেদনা রহিয়াছে। তীর্থপথের মধ্যে তিনি ধ্যানী মানব-মনের চিরন্তন সৌন্দর্য-তীর্থের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ধরণীর দুঃখ-দুর্দশার ঊর্ধ্বে তাঁহার কবিচিত্ত এক উচ্চস্তরে নীড় বাঁদিয়াছে এবং এইজন্যই তাঁহার কবিতাবলীর মধ্যে প্রবল উত্তেজনা নাই। পরন্তু কাব্যলক্ষ্মীর অতি শান্ত-সমাহিত মূর্তি সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার শব্দ-চয়ন, ছন্দের গম্ভীর ভঙ্গি, ভাষার মাধুর্য এবং ভাবের নির্মলতা পাঠকের চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।' একালের পাঠক তাঁর নিজস্ব বিচার-বিবেচনা আর অনুভবের নিরিখে সেকালের এই সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অভিজ্ঞতা আর আস্বাদনের মধ্য দিয়ে হেমচন্দ্র বাগচীর মতো একজন প্রায়-বিস্মৃত কবিকে নতুন করে জানবেন; প্রকাশকের এই অভিপ্রায় আশা করি যোগ্য সমাদর লাভ করবে।

৭৪/১৭ লালাবাবু সায়ার রোড
বেলুড় মঠ, হাওড়া
২৩ জানুয়ারি, ২০০২

সুশান্ত বসু

সূ চি প ত্র

দীপান্বিতা (১৯২৮)

তীর্থপথে (১৯৩২)

মানস-বিরহ (১৯৩৮)

অগ্রন্থিত-কবিতা :

দীপান্বিতা
১৯২৮

'বিস্মরণী'র কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার কর-কমলেষু

স্নিগ্ধ ছায়া-তরু-তলে ফিরিছে কে বালকের মতো—
কল্পনায় মধু চুষি ভোলা আত্মহারা,—
আমারি গাঁয়ের পথে তারে হেরি—চলিছে নিয়ত,
নব মধুচ্ছন্দা সে কি,—ছুটায়ে ফোয়ারা?
ব্যথায় বিবর্ণ মুখ,—পুরাতনী স্বপ্ন বহে বুকে,—
হেরে দূরে জনহীন সবুজ শ্মশান!
ধ্যানে কার মূর্তি ধরি রহিলো না অনায়াস সুখে
ফেরে তারি মন্ত্র জপি সারা দিনমান!

সারা দিনমান তারি ছায়া হেরি চিত্ততলে মোর—
ধীরে-ধীরে সঞ্চ রিছে আনন্দ-মন্থর।
সে তো 'বিস্মরণী' নয়— স্মৃতি-তীর্থ, শান্ত প্রীতি-ডোর ;
তারি সাথে উঠে গান, সুন্দর, সুন্দর!

গোকুলনগর, দেবগ্রাম,

নদীয়া, কার্তিক-সংক্রান্তি, ১৩৩৫

হায় গো তামসী

(দীপান্বিতা)

হায় গো তামসী, তোমারি লাগিয়া আকাশে আতশ খেলিছে ধরা—
চিরদিবসের মানস-হরা!
কি বেশে এসেছ অমা-নিশীথিনী, রমারে হেরিনু তোমারি পাশে ;—
সুমোহন বেশে মধুর হাসে।
অলখ-সেতারে গুঞ্জন তার মরমে আসে।
সে আদিকালের গভীর আঁধার নব বধূবেশে সলাজস্মিতা
তিমিরময়ী গো দীপান্বিতা!

তোমারি মাঝারে হেরি ছায়া যার, মনে হয় সে যে বাসিত ভালো।
পরানে ফুটাত করুণ আলো!
শিহর-আতুর কর-কিশলয় আজো যে জাগিছে মরম-তলে ;
বিবশ হিয়ার কুসুম-দলে,
কেবা সে গোপন মরমী পবন নীরবে চলে!
সুনিবিড় তব গুণ্ঠন-তলে নহে সে কিশোরী অপরিচিতা,
তিমিরময়ী গো দীপান্বিতা!

আজি মনে হয় হেরেছি তাহারে পরান ভরিয়া কত-না দেশে,
কত বেদনায়, কত-না বেশে!
তাহারি কাঁকন বেজেছে আমার নিশীথ-দুয়ারে ঝিল্লি-সাথে!
নিদ্রাবিহীন নিথর রাতে,
চমকি জেগেছি বেদনা-বিভোল শারদ-প্রাতে!
তোমারি আঁচলে ঢেকেছি আনন, সে যে চিরদিন অপরাজিতা—
দীপান্বিতা গো দীপান্বিতা!

তোমারি আলোক-উৎসব চলে শশীহীন আধো আঁধার মাঝে
জানি না তো হায় কিসের লাজে,
থমকি থেমেছ মাঠ-পরপারে ঝিল্লি-নূপুর মুখর নহে!
মৌন বেদনা নীরবে বহে।
ঘন-কম্পনে সে দেহ-লতিকা শিহরি রহে।
কিসের লাগি সে সুখ-শিহরণ কহ তুমি কার পরশ-ভীতা,
শেফালির সখী দীপান্বিতা!

তোমারে হেরেছি কিশোরী বালিকা,—দীপের মালিকা পরেছ গলে,
সুনিবিড় কালো বুকের তলে
যে বাণী মুরছি ছিলো গো একদা, আজি সে রুচিরা আতুরা বড়
কোমল মাধুরী মধুরতর।
কালো কেশপাশে অনাদি আঁধার নিবিড়তর।
কোথা সে তরুণ বল্লভ তব, শীত-সমীরের পরশ-প্রীতা,
মিলন-ব্যাকুলা দীপান্বিতা!

* * *

এলো সে অসীম আঁধার বিথারি কালো এলোচুলে মালতী-মালা—
গোধূলি-বেশিনী কে সেই বালা?
শ্যাম বন-পথ-স্মৃতির বেদনা সিঁথির সীমায় কে দিলো রাখি!
অস্ত-মেঘের মিনতি মাখি

আনতা বধূটি এল কি আনীল-তারকা-আঁখি!
আঁধারে জাগিলো অথির দেবতা—এলো সে আমার সোনার সীতা!
শরম-চকিতা দীপান্বিতা!

আলো হয়ে যায় আলো হল হায়, অনাদি আঁধার দিনের তীরে
ভুলিব কেমনে সে তটিনীরে?
কল-কঙ্কণে চল-কিঙ্কিণী বাজায়ে চলিল নটিনী-রানী—
ভাষা-আশা-গান সে দিলো আনি ;
বুঝি বা রুধিল অধীর মরণে আঁচল টানি।
আজি তারি বাঁশি বাজাইবে কবি—সে কি রঙ্গিলা মানস-মিতা!
অতিসারিণী গো দীপান্বিতা!

ঝর-ঝর-ঝর ঝরিলো কি বারি, থর-থর-থর কাঁপিলো হিয়া
মধুর আবেশে আন্দোলিয়া!
গত-দিবসের হারানো ব্যথা কি মূরছি পড়িল মরম-তটে!
করুণ রাগিণী সে ছায়ানটে
চাঁদিনী নিশায় কাঁদিয়া কপোত বেদনা রটে!
ব্যথার সোহিনী গাহি শুধু তাই—হৃদয়ে জ্বলিছে স্মৃতির চিতা!
মরম-মোহিনী দীপান্বিতা!

আজি বসি তাই রক্ত-আখরে রচিনু স্বপন ; স্বপনে গাহি
কোথা সে তরণী—সরণি বাহি।
বাধা জাগে তাই নাচিছে পরান—ঈশান-কেশর-বাসিনীসম ;
কঠিন ভ্রূকুটি কি মনোরম!
অধীর আঘাতে ফুটিবে জীবন আদিমতম।
মাতিয়া উঠিব দূরেরি নেশায় ; অপরাজিতা সে অপরিচিতা!
তিমির-বধূ গো দীপান্বিতা!

কবে গঙ্গার তীরে-তীরে তোরে অনুসরি ফিরি মনেরি মনে ;
শেফালি-ঝরায় সঙ্গোপনে।
মাঠেরি বিরহ বেজেছিল বুঝি রৌদ্র-ঝিমানো বটেরি ছায়ে ;
সোনালি ঘুঙুর রুণিছে পায়ে—
শ্যামল পরশ-বুলানি আঁচল সকল গায়ে—
আসিলে আজো কি সুদূরিকা সখি, নিখিল-জনের মানস-নীতা!
কবিতাময়ী গো দীপান্বিতা!

তারকা-ঝরোকা খুলি এলে কবে অকবি-জনের মরম-তলে
আজো সে পরশ ভুলিনি বলে

শিরায় শিহর জাগে অহরহ—পরান উথলে নবীন-স্নেহে ;—
উতল, অধীর, মদির দেহে,
সোনারি সারঙ্ বাজিছে গভীর হৃদয়-গেহে ;—
নব দীপমালা সাজায়ে এলে কি জ্যোতি-ঝলমল অপরাজিতা
মানস-বধূ গো দীপান্বিতা!

মক্ষি-রানী

মধু-সন্ধানী জীবন খুঁজিছে
হৃদয়-সাথী ;
তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন তাই
দিবস-রাতি।
শুধু ঘুরে মরি, গান গেয়ে যাই
পথের 'পরে ;
কোমল কমল-পিয়াসী পরান
দহিয়া মরে।

কহ-কহ মোরে মৌন-আননা,
কি ভাষা মনে!
বিবশ দিবস রসহীন বৃথা
অন্বেষণে!
যে ছবি হেরিব নয়নে তোমার
আবেশ-ভরা,—
দুগ্ধ-সরিতে স্নান-শেষে যেন
হাসিবে ধরা!

তারে নাহি পাই ; বৃথা গান গাই
জীবন ভরি।
ভাবি মনে হায়, কবে হবে শেষ
এ শর্বরী!
শুধু দিশাহারা অমানিশা জাগে
তৃষার সাথে।
তরুণ জীবন-অরুণ উঠে না
মধুর প্রাতে।

ভাবি মনে তুমি অপর্ণা কি গো
তাপসী কৃশা!
ধুতুরার ফুলে গিরি-রাজ-সুতা
পেয়েছে দিশা!
সারা প্রাণ ভরি শুধু গৈরিক,
সে উদাসিনী—
তপোমোহ-ঘোরে ভুলে সে কামনা
তাহারে চিনি।

চিরদিবসের গুণ্ঠন-মাঝে
পলক লাগি
চাহ-চাহ ওগো করুণ-আননা
সহসা জাগি!
সে আঁখি হেরিয়া জীবনে আমার
ঘনাবে মায়া।
ধূসর ঊষর মরুরে ঘিরিবে
মেঘের ছায়া!

আমার মানস-শতদল-তলে
মক্ষি-রানী
কি ধূপ-দহনে উঠিবে জাগিয়া
জানি গো জানি।
যে দীপ-শিখারে জ্বালায়ে ধরিব
পরান-পণে,
শিরায় জাগিবে শিহর তাহার
· পরম-ক্ষণে!

সারা বিশ্বের কলভাষা পশে
শ্রবণে তব।
কত ধূপ দহে কত কামনায়
কেমনে কব?
কত সঙ্গীত কত-না মালিকা
হয়েছে গাঁথা।
একটি গোপন মরমে তোমার
আসন-পাতা।

কত জীবনের কত মধু-ধারা
মিলেছে এসে ;

কত উন্মন উদাসী মিলেছে
উদয়-বেশে!
সোনার গোধূলি কহিছে যেথায়
দূরের বাণী—
মহিমায় সেথা বিরাজিছ মোর
মক্ষি-রানী!

বন্দিনী সে নারী

বন্দিনী সে নারী
লক্ষ কোটি নাগ-পাশ অপসারি অনায়াসে, মুক্ত হবে কবে?
প্রথম মোচন-গান প্রভাত-সঙ্গীত-সম ধ্বনিবে ভৈরবে!
বক্ষের পঞ্জরে মোর মুক্ত তার কল-ভাষা সবেগে সঞ্চারি
অবাধ উদ্দাম ভঙ্গে বন্ধ অপসারি
মেখলা-চঞ্চল নৃত্যে সঞ্জীবনী প্রাণময়ী ধারা,
সুদূর সিন্ধুর গানে যেন আত্মহারা,
বিকশিবে আপনার নবীন যৌবন-রূপ পূর্ণ সুরে তারি—
মানস-গহন-তলে শৃঙ্খল-পীড়িত-দেহা বন্দিনী সে নারী!

অশ্রু নাহি হেরি।
সে দুটি কমল-নেত্রে লুপ্ত উৎস বেদনার। রক্ত যেন ঝরে!
সন্ধ্যাম্লান সূর্যমুখী, তুহিন-বিশীর্ণ-কান্তি ; কল-গীত-স্বরে
জাগে না জাগে না আর। ক্ষীণ তনু ঘেরি
বিষাদ প্রসারে ছায়া। পথে-পথে বাজিছে প্রস্তর ;
উপল-বিষম-গতি বিলীন তটিনী যেন—দুশ্চর দুস্তর
বাধা-সিন্ধু বিক্ষোভিছে—দিগন্ত-চুম্বিত-সীমা! রণিছে শৃঙ্খল ;
শক্তি নাই, শক্তি নাই ; মুক্তি তারে দিবে কিসে ব্যথিত বিহ্বল!

পাথার-পারের দেশে সুদুর্গম দুর্গ-শিরে, রুদ্ধ কক্ষতলে,
বন্দিনী সে নহে-নহে অনায়াস-জড়তার ভারে।
বিবশ দিবসগুলি যাপে না সে আলস-আবেশে,
চিরমুগ্ধা নায়িকার বেশে!
রাজার তনয়-স্বপ্নে মগ্না নহে অনুদিন। তাই বারে-বারে
মসৃণ পথের রেখা লুপ্ত হয় চিরতরে। স্তব্ধ বক্ষতলে,
কর্মের বাণীরে শুনে লগ্নপাণি নতনেত্রা মৌন অশ্রুজলে!

সে মোর বন্দিনী প্রিয়া—দিনে-দিনে তারি লাগি পথ অতিবাহি,
কণ্টকে বিক্ষত পদ, তৃষায় আতুর কণ্ঠ, দিশা নাহি-নাহি।
অতীত পথের পানে বারে বারে ফিরে ফিরে চাহি।
দুর্বহ বহন-ভারে পরিম্লান জীবনের ডালি
কেহ না লইবে তুলে। শুধু ধূম, শুধু শিখা, ভস্ম আর কালি—
তারি মাঝে পথ-রেখা আঁকি।
বিপুল বন্ধন-পিষ্ট ধূলিজাল উড়াইবে না কি
সুদূর ঈশান-লীন, অধীর, ধূমল-দেহ হে কাল-বৈশাখী!

ভাবি তাই রিক্তপ্রাণ, বিত্তহীন, ব্যর্থ, অর্ঘ্য দিয়া
সকল প্রয়াস-শেষে তোরি তরে দুঃখ-স্বর্গ রচি দিব প্রিয়া!
অমৃত-কমল কবে উন্মেষিবে নিষ্পেষিয়া মোরে,
তাহারি পরাগ-মধু ব্যথাস্মিত তোমারি অধরে
সমর্পিব,—হেন স্পৰ্দ্ধা চিত্ত-তলে রহি-রহি বাঁধে নাই বাসা।
দুর্বার পীড়ন-ত্রস্ত এ বন্দী-জীবন ভেদি অঙ্কুরিত আশা
কতবার দগ্ধ হল, ব্যর্থ হল কতবার। হে বন্দিনী প্রিয়া,
আমার জীবনে তাই তোমার অর্চনা হবে ম্লান মাল্য দিয়া!

সে মালা তোমারি কেশে দোলাইব পলকে-পলকে।
তারি ডোর-বন্ধে-বন্ধে কেয়ূর-নূপুর দিব রচি ;
পরাইব কণ্ঠে তারে কনক-মালিকাসম। ঝলকে-ঝলকে
উচ্ছ্বসিত রক্তস্রোতে অলক্তক দিব যে বিরচি।
উষার সলাজ দৃষ্টি অর্পিবে আননে মোর, হে বন্দিনী প্রিয়া,
দহন-বিশীর্ণ-প্রাণ-বিনিময়ে মুক্তি তব লইব জিনিয়া!

উদাসিনী প্রিয়া

উদাসিনী প্রিয়া চাহে না আমার কোমল পরশটিরে।
কালো কেশে দিনু নবীন কুসুম, ফেলিলো নয়ন-নীরে!
কণ্ঠে দোলাই যে মণি-মালিকা, তারে রাখি দেয় তুলে
বাতায়ন-পাশে বসি একাকিনী চম্পক-অঙ্গুলে,
অধীর বীণায় আনে গুঞ্জন ; যেন ঘন কালো নীরে
নীরবে ঘনায় অনাদি আঁধার তারি সুরে ধীরে-ধীরে।

কি আলো তাহারে করে উন্মাদ আজি এ বিজন-পুরে,
ভোরের পবন কি বাণী জানায় নব টহলের সুরে!

চাহিয়া নয়নে নাহি পাই তার চিরপুরাতনী দিশা ;
কি তার কামনা, কিবা তার আশা, কেমন মনের তৃষা!
সে যে চাহে দূর—আমি খুঁজি সুর জীবনের পথে ঘুরে।
মাতি উঠে মনে চিরচঞ্চল ফিরে যাই দূরে-দূরে।

বাড়ে ব্যবধান। ভুলে যাই মনে কি আর রয়েছে বাকি!
উদাসী বাতাস ফিরে চারিপাশ গুমরিছে থাকি-থাকি।
ক্ষণে-ক্ষণে জাগে নবীন বাসনা নব মুকুলের মতো,
নূতন করিয়া করিব আপন হারানো বেদনা যত।
উতল জীবন-দোলা লাগে প্রাণে ; মুখর মনের পাখি
কলভাষে করে আলোকে সিনান। পিঞ্জর দূরে রাখি।

উদাসিনী প্রিয়া কেশ আকুলিয়া কত যুগ-যুগ ধরি।
নীরবে মরিছে দখিনা বাতাস ; হেনা পড়ি যায় ঝরি।
আকাশের শশী আছে বসি যেন কবে সে জাগিবে বলি!
করুণ নয়নে চপল হাসির বিভাটি উঠিবে ঝলি!
রাঙিবে কপোল ; নব কল্পনা-মঞ্জরী উঠে ভরি।
উদাসিনী মোর বিরহে রচিছে মিলনের শর্বরী।

খেয়াল-খুশি

আজি কি খেয়াল খেলিছ বসিয়া
চন্দ্রাননে,
কিসের খুশিতে হাসি ভাসি উঠে
তোমার মনে!
তোমার চোখের চপল চাহনি
ভুবন ঘিরে ;
খেয়ালে ফুটালে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে!

তোমার খেয়ালে জীবন আমার
উঠিল রাঙি।
তোমার খুশিতে হাসি ভাসি উঠে
বাঁধন ভাঙি।
কলভাষে তব আশা জাগে প্রাণে
গোপনে ধীরে,

খেয়ালে ফুটালে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে!

যেথা নিশিদিন শ্বসি উঠে বায়ু
উদাস-গীতে,
বহালে সেথায় মলয় পবন
অপরিচিতে!
কাননে-কাননে যেথা অলিকুল
হতাশে ফিরে,
সেথায় জাগালে খেয়ালে হৃদয়-
পদ্মটিরে।

তাই মনে হয় খেয়ালে জাগিছে
চন্দ্র-তারা।
খেয়ালে ঝঞ্ঝা ঘুরিয়া মরিছে
বাঁধন-হারা।
কোন সে খেয়ালী, খুঁজে ফিরে তারা
ব্যাকুল বেগে!
নিয়মিত হল গ্রহ-তারা তারি
আঘাত লেগে!

কাঁদি ফিরে যবে নিঃস্ব পরান
বিশ্ব-মাঝে ;
চল-চরণের মঞ্জীর-ধ্বনি
খেয়ালে বাজে!
ছায়া নামে তাই—শ্যামলবরনী
স্নিগ্ধ ছায়া ;—
জাগি উঠে গান। তৃপ্ত মরমে
জাগিছে মায়া।

খেয়াল-খুশিতে হাসিতে ভাসিতে
নিয়ম ঘুরে।
সৃষ্টি জাগিছে খেয়ালে কাহার
শূন্য জুড়ে!
প্রবাহ আনিয়া শুষ্ক জীবন-
সরসী-নীরে,
খেয়ালে ফুটালে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে!

লীলা-কমল

এ লীলা-কমল দোলাব তোমারি বুকে—
নব-নব কৌতুকে!

কোমল মৃণাল মৃণাল-ভুজের পাশে ;—
শঙ্খ-গ্রীবায় সরসী-সুরভি নিয়া
সারা তনুখানি ব্যাপিয়া মধুর হিয়া
সরোজ-কিশোরী ফিরিবে তোমারি আশে :

বাহির-বাঁধনে পারি না বাঁধিতে তোরে।
কোমলা তোমায় বাঁধিব কমল-ডোরে।

অফুট কোরকে রেখেছি প্রাণের তৃষা—
শেফালি-গন্ধ-মিশা।
কাশের হাসিটি সুদূর-বিসারী মাঠে ;
চপল মেঘের কাজল বরনখানি,
বরষা-শেষের তৃণের আসন আনি
বিছায়ে রাখিব যতনে হৃদয়-পাটে।

নলিনী-দলের সবুজ শয্যা 'পরে
অতসী-কুসুম সাজাইব থরে-থরে।

উশীর-লেপনে স্নিগ্ধ কুচের চূড়া ;
লোধ্র-কেশর-গুঁড়া,
পাণ্ডু কপোলে, আনত আঁখির নিচে,
যে মোহন-মায়া চকিতে উঠিছে দুলে,—
পূর্ণা তটিনী যেন কলরোল তুলে ;—
সে মেঘ-মায়ার সকলি নহে তো মিছে!

প্রাচীন দিনের প্রসাধনে তাই প্রিয়া,
সাজাব তোমায় এ লীলা-কমল দিয়া!

কদম-কুসুমে আজি

কদম-কুসুমে আজি প্রিয়ারে সাজায়ে দাও বাদল-দিনে।
শ্রাবণ-মেঘের মতো হারানো হৃদয় তার লও গো জিনে।
কত রাতি কত দিন চলিছে বিরামহীন বিফল কাজে ;
আজি এ মিলন-দিন বিরহে বিফল-করা আর না সাজে ;
আঁধার গগনতল ঝরিছে নয়ন-জল ;
বেদনাবিধুর হিয়া সদা করে টলমল।
বিফল জীবন আজি সফল করিয়া লও প্রিয়ারে চিনে।
কদম-কুসুমে আজি তাহারে সাজায়ে দাও বাদল-দিনে।

সুদূর অগম পথ অচল জীবন-রথ কিসের লাগি?
পথিকজনের হিয়া আজি ফিরে সচকিয়া কাহারে মাগি!
জানো না জানো না হায়, দিনগুলি চলি যায় দিনের পিছে!
ভাবনা-সাধনা সব কিসের লাগিয়া যেন হইল মিছে!
আজি কেন অকারণে মনের গহন বনে,
একেলা কাটাও দিন ব্যাকুল বিষাদ-সনে!
কেতকী সুবাসে তার সুরভিত করো কেশ রজনী জাগি।
সুদূর অগম পথ অচল জীবন-রথ কিসের লাগি!

আজি পাশে বসি তার বাহু-ডোরে পড়ো বাঁধা শ্রাবণ-রাতে!
অবিদিত-গত-যাম রজনী চলিবে কিরে ঘুমের সাথে!
প্রিয়ার মরম-পাখি মরম-কুলায়ে তব পশিবে ধীরে।
কানে-কানে কহ তার পরশি কপোলদুটি চাহ গো ফিরে!
শরম-জড়িত সুর ভরিবে পরান-পুর ;
সুদূর হইতে কানে মিলন-বাঁশির সুর
পশিবে-পশিবে ধীরে আঁধারের বুক চিরে হরষ-সাথে।
প্রিয়ারে লও গো চিনে আজি পাশে বসি তার শ্রাবণ-রাতে!

বহুদিন হল হায়, চলেছ জীবন-পথে ; চাহনি ফিরে!
কতনা মিলন-ক্ষণ বৃথাই চলিয়া যায় গোপনে ধীরে!
আজি এ বরষা-রাত যাপ-যাপ প্রিয়া-সাথ সকল ভুলি।
এ কালসাগর-তটে নাহি-নাহি মিলনের মুকুতাগুলি!
তাহারা অতল-তলে নীরবে রহিয়া জ্বলে
গভীর গাহন করি আপন মানস-জলে,
যে-জন পায় গো তারে, সে-জন পরম ধনী সাগর-তীরে।
আজি সে মিলন-দিন প্রিয়ারে সাজায়ে দাও চাহ গো ফিরে।

সন্ধ্যামণি

আজিকে দিবস-শেষে সন্ধ্যামণি, হেরিলাম তোরে—
হরিৎপল্লবতলে অস্তরাগ-রক্তিম তনিমা,
মৃত্তিকার নবীনা দুহিতা। দূর গ্রামসীমা
নব বারি-ধারা-ধৌত ধরণীর অঞ্চলের ডোরে,
শ্যামল তৃণের গন্ধে ক্ষণে-ক্ষণে উঠিছে শিহরি।

রজনীগন্ধার বনে পুষ্পময় যূথিকা-জালকে,
স্নিগ্ধা তরু-লতিকার কোমল পল্লবে,
সমীর-পরশে যেন জাগে থরথরি,
পূর্ণতার কোমল মাধুরী। তারি মাঝে পলকে-পলকে,
সন্ধ্যার গুণ্ঠিত ছায়া ধীরে হেরি আসিছে ঘনায়ে ;
আজিকার শান্ত মৃদু বায়ে,
মৃদুতর গন্ধ তব সন্ধ্যামণি, বিলাও বল্লভে!

প্রিয়ার আননে তোরে হেরিলাম সন্ধ্যার মণিকা,
একদা দিবস-শেষে শান্ত দীপশিখা
স্নিগ্ধ তার জ্যোতিটিরে দিলো প্রসারিয়া।
আঁধার-আলোক-তলে মূর্তি তার পড়িল নয়নে ;—
শ্যামল পল্লবে যেন সন্ধ্যামণি উঠেছে ফুটিয়া,
প্রেম-রাগ-রক্তিমা বল্লরী ; ম্লান আলো কাঁপে ক্ষণে-ক্ষণে।

চুম্বন চাহিনু যবে, ত্রস্তা, ভীতা আনন্দ-লতিকা
সমীর-গুঞ্জনে যেন উঠিলো চমকি!
দাঁড়ালো থমকি
সহসা জগৎ মোর ক্ষণমাত্র পলক স্মরিয়া।
সর্ব স্তব্ধ অন্ধকার-রন্ধ্র-পথ দিয়া
প্রতীক্ষার রুদ্ধ ব্যথা মর্মে মোর উঠিলো গুমরি।

টানি তারে বক্ষ 'পরে,
অধরের মৌন ভাষা রাখি দিনু সস্মিত অধরে।
অমনি শিহরি
মুদিলো নয়ন-দুটি। খসে যায় কবরী-গুণ্ঠন ;
হেরিনু মোহন,
সদ্য সে অলক-বন্ধে সূত্রহীন অনিন্দ্য গ্রন্থনে,
সন্ধ্যামণি, বন্ধ তুমি অন্তহীন প্রেমের বন্ধনে।

মাটির প্রদীপ

আজি হেরি কুঞ্জতলে প্রস্ফুটিত দোপাটির বনে,
ঝরা ফুল-পল্লবের পাশে,
নবোদ্গত তৃণদল মঞ্জরীর ব্যগ্র আশাটিরে
সঙ্গোপনে মর্মতলে রাখিছে লুকায়ে।
শেফালির শ্যামদেহে কুসুমের নব সম্ভাবনা ;
গগনে-গগনে চলে সৃজনের নবীন জল্পনা।
ক্লান্ত কায়ে পরশ বুলায়ে
নির্মল শারদ বায়ু প্রবাহিছে ধীরে। নীলাকাশে,
চপল মেঘের দল। বিকশিছে কাশ ক্ষণে-ক্ষণে।

পশ্চিম গগনে আজি নব রক্ত-সন্ধ্যাব সঞ্চারে,
বিমল সরসী-নীরে সদ্যস্নান-শেষে
ফিরিছে পল্লীর বধূ, সিক্তবাসা, পূর্ণকুম্ভ বহি—
চূর্ণালকে ছায়াম্লান ভঙ্গ জলকণা ;
নয়নে স্ফুরিছে হাসি, বক্ষতল-কমল-কোরকে
জাগে কত স্বপ্ন-সাধ, কত-না বাসনা,
কত হাসি, রসোৎসব, কত গান কত-না পুলকে
উদিছে, মুদিছে আশা। হেরি রহি-রহি
মৌনা নিশীথিনী নামে লাজনত বেশে
আবরি শ্যামল তনু ম্লান মেঘ-বসন-সম্ভারে।

মাটির প্রদীপ—তার স্নিগ্ধ দ্যুতি আলিঙ্গিছে ধীরে
পর্ণকুটিরের দ্বার, নিদ্রাশান্ত স্নেহানন গুলি,
জীর্ণ ম্লান কয়টি বসন, অঙ্গনের তুলসী-মন্দির ;
তার পরে কাঁপি উঠে তীব্র বায়ে। দীপ্তি উঠি ঝলি
নিবে যায়। শীর্ণ ছায়া প্রাচীর-বাহিরে
নীরব কম্পনে যেন উঠিছে ব্যাকুলি।
ঝিল্লির ঝঙ্কার চলে। বায়ু-শ্বাসে কাঁপে তরুশির।

বল্লভের বাহুর শিথানে,
শ্রান্তা বধূ ধীরে-ধীরে পড়েছে ঘুমায়ে।
অবিন্যস্ত কৃষ্ণকেশ, গাঢ় সুপ্তি-শিথিল বাসনা ;—
ক্ষুদ্র নব দেহাধার—শিখা তার প্রেম-আরাধনা ;
রাত্রির বাসরে জ্বলি প্রিয়-বক্ষে আনন লুকায়ে,
বিশ্বের সকল ব্যথা ভুলে যায় ; রোমাঞ্চ-কঞ্চুকে
তনু-গাত্রী মুহুর্মুহু উঠে শিহরিয়া। শান্ত তৃপ্ত মুখে

মৃদু প্রভাতের বায়ে জাগে সচকিয়া,—
মাটির প্রদীপ যেন স্নিগ্ধা, শ্যামা দিবা-অবসানে।

বিদায়-দিনের স্মৃতি

সেই যে হল দেখা
তোমায়-আমায় বিদায়কালে ;—এই স্মরণের রেখা
রইল লেখা মনের কোণের জমাট স্মৃতির স্তূপে।
রইল চুপে-চুপে।
রইল গোপন নিবিড় বেদন ; সরলনাকো বাণী।
ওগো আমার রানী!

তোমার শাড়ির রক্ত-রেখা আজ্‌কে থেকে-থেকে
আসছে যেন অনেক দূরের হেনার গন্ধ মেখে,
বাদল-ভেজা মেঠো পথের ব্যাকুল গন্ধ নিয়ে,
আমার বিধুর মনের মাঝে ওগো আমার প্রিয়ে!

সেই রেখাটি আমার মনে রইল জ্বল-জ্বল,
তাই-তো ছল-ছল
অকারণেই আঁখির কোণে জম্‌ছে অশ্রুধারা,
অনেক দিনের আঁটন-বাঁধনহারা।

অনেক দুখে-শোকে,
অশ্রু ছিলো কঠিন হয়ে। আজ সে দিবালোকে
তপ্ত হয়ে ঝর্‌লো, ভাবি তাই,
বিফল হল কঠিন হওয়ার গোপন সাধনাই।

হায় রে আমার বিদায়-দিনের স্মৃতি,
এই কি তোমার অভিসারের রীতি?
এই কি তোমার ব্যথার কাঁটা-হানা?
দিন-যাপনের গ্লানির মাঝে আস্‌তে তোমার ছিল যে হায় মানা।

আবার কবে ভবিষ্যতের পথে,
তোমায়-আমায় হবে দেখা—কোথায়, কেমন-মতে!
কেমন করে চাইবে তুমি প্রিয়া,
আতুর বিধুর আশায় ভরা কোমল দৃষ্টি দিয়া!

কেমন করে কাঁপবে আমার বেদন-ভরা গুম্‌রে-মরা হিয়া!

সেই বিদায়ের দিন
আমার মনে রইল প্রিয়া, রইবে যে নবীন।
বইব যত কাল
এই জীবনের কাঁদন-মাখা ব্যাকুল ব্যথার জাল,
মাঝে-মাঝে হেরব তারি ফাঁকে,
অধীর স্মৃতি সেই দিনেরে কেমন গোপন রাখে
আপন বুকের মাঝে!
তোমার শাড়ির রক্ত-রেখা কেমন রাগে হায় গো সেথা রাজে!

আঁধার মেঘের গায়,
তড়িৎ-সখী যেমন করে চমক দিয়ে যায়,—
তেমনি করে মোর পরানের নিবিড়, ঘন মেঘে
বিদায়-দিনের স্মৃতির হাওয়া লেগে,
তোমার পাড়ের রক্ত-রেখা শুধুই চমক হানে।
আলোর বাণী নাই যে কোথা গুম্‌রে মরি প্রাণে।

ব্যবধান

আমার জীবন-মাঝে প্রেয়সীর রূপে.
তুমি নারী চুপে-চুপে,
এসেছ অর্গল খুলি সস্মিত আননে ;
সেইদিন কাননে-কাননে,
অজস্র কুসুমরাশি ফুটেছিলো আমারি লাগিয়া
প্রিয়া মোর প্রিয়া!

সেই সুধাহাস্যধারা, সেই তব প্রেমঅর্ঘ্যভার
জীবন-বীণার তারে তুলেছিলো কি নব ঝঙ্কার,—
আজি এ নিশাতে
স্মরি তাই। সেই শুভ্র সুকোমল হাতে
আমার বেদনারাশি, আমার এ তুচ্ছ সুখভার
কেমনে নিয়েছ তুলি মনে তাই পড়ে বার-বার।

সেথা তুমি সঙ্গী মোর, ওগো নারী, শরম-কুণ্ঠিতা,
হে তরুণী, লাজাবগুণ্ঠিতা,

সেথা তব হৃদয়ের সুশুভ্র আসনে
আমারে দিয়েছ স্থান। প্রেম-আবরণে

আমার হৃদয়-দাহ তৃষ্ণা-ক্লেশ রাজি
সযতনে দূর করি স্মিতমুখে দাঁড়ায়েছ আজি
আমার এ মানসের প্রতিমার বেশে,
অতি ধীরে লাজহাসি হেসে!

রয়েছ হৃদয়ে। তবু, ভাবি তুমি আছ কতদূরে?
সেথা মোর চিত্ত মরে ঘুরে।
হাসি তব, আঁখি তব, তব নিত্য লীলা-চঞ্চলতা—
প্রাণে শুধু জাগে সেই কথা।

রানী ওগো রানী,
আজি মোর তপ্ত ভালে রাখ তব স্নিগ্ধ হস্তখানি।
এ ক্লিষ্ট আঁখির 'পরে রাখ তব স্থির আঁখিতারা।
কোথা তুমি?—স্তব্ধ রাত্রি ; শশী নিদ্রাহারা
নিঃশব্দে ঢলিয়া পড়ে অস্তাচল-পারে।
প্রিয়া মোর, জাগো-জাগো হৃদয়ের গভীর আঁধারে।

আষাঢ়-শেষে

তরুণ আষাঢ় আজি ফিরে যায় কাঁদিয়া-কাঁদিয়া
ভগ্ন প্রাণে পুঞ্জ মেঘ-উপহার লয়ে।
শুধু হায় এনেছিল বয়ে
নবীন আশার বাণী, তাই গেল নীরবে কহিয়া
রজনী-গন্ধার কানে, যূথিকার মৃদু পরিমলে,
কণ্টকিত কেয়া-বনে, পল্লবিত ভুঁই-চাঁপা-দলে।

আর কার লাগি
এনেছিল কোন অর্ঘ্য সুদূরের মায়াপুরী হতে
সুপিঙ্গল ঘন কেশে তীব্র হেসে ব্যাকুল মরতে,
কেহ নাহি জানে। তাই সে বিরাগী
সঞ্চিত বেদনা তার দিলো মেঘে, দিলো বরিষণে,
পুষ্পিত কদম্বতলে, পরিম্লান রেণু-পরশনে।

আজি তার যাত্রাপথে ঘন-ঘন বাজিছে মাদল ;
বিরহীর দল
দাদুরির উচ্চরোলে ব্যথাঘন বরষা-নিশীথে
বিদায়-পথিকে দিল ঘন অশ্রু-বাষ্প-উপহার।
আজি তাই বিষন্ন আষাঢ়
বিদায়-বেদনা-ভরে সকরুণ গীতে,
শ্রাবন-সখারে তার ডাকি দিল সজ্জিত সভায়।
তারপরে ধীরে ধীরে মাগি নিল প্রশান্ত বিদায়।

কোথায় সে কতদূর শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির শিরে,
উত্তরের পথে,—
সঙ্গহীন দীর্ঘশ্বাসে কামচারী পুঞ্জ মেঘরথে
আষাঢ় চলিলো ফিরে নয়নাশ্রুনীরে
পুঞ্জিত বেদনা বহি রিক্ত দীন বিরহীর বেশে,
আজি তার বিদায়ের আয়োজন-শেষে,
কেহ নাই শুধাবার!
হে বিরহী, তরুণ আষাঢ়,
আজি মোরে কহ ধীরে,
কার লাগি চলিয়াছ ফিরে
তপস্যার আয়োজনে, বিদ্যুতের বহ্নিজ্বালা বহি—
হে কিশোর মিত্র মোর, যাও মোরে কহি!

কোথায় সে প্রিয়া তব, যার লাগি চলিয়াছ খুঁজি
দেশ হতে দেশান্তরে নদী-গিরি-কন্দর লঙ্ঘিয়া
অশ্রু-বাষ্পে শূন্যতল ভরি!
আতুর বনজ-বায়ু নব পুষ্প-সৌরভ আহরি
তোমার ধূসর কেশে ম্লান হেসে দিলো সুরভিয়া!
বিমুগ্ধা প্রিয়ার লাগি চলিয়াছ আজি তাই বুঝি—
দূরে-দূরে ঘুরে মরি ক্লান্ত কায়ে আঁখি-জল-ধারে,
প্লাবিয়া পর্বত-নদী, তবু হায়, দেখা হল না রে!

হে চিরতরুণ বন্ধু, আজি তব বিদায়ের দিনে,
চাহি দূর ছায়া-ম্লান শ্যামল বিপিনে,
বিরহ-ছায়ায় মোর ভরি উঠে সকল অন্তর।
শ্রাবণ আসিছে জানি ভরি নদ-কান্তার-প্রান্তর,
দিশে-দিশে কলরোল তুলি।
নীপশাখা নীরবে আকুলি
আজিকে চলিলে তুমি বারিসিক্ত বনবীথি দিয়া

মন্থর গমনে,
বহি মনে-মনে
ব্যাকুল চিন্তার ভার, রহি-রহি কাঁদিয়া-কাঁদিয়া,
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে নিখিলের চিত্ত আকুলিয়া
স্বল্প-পরিচয়ে,
নিষ্ঠুর দয়িতা লাগি নব প্রেম নব বাণী লয়ে।

জন্মান্তর

সেদিন-ও নয়নে নেমেছে স্বপন নিশীথের অনুরাগে।
উতল বাতাস আনে সাথে-সাথে হেনার সুরভিটিরে।
পশ্চিম নভে ঢলিয়া পড়েছে শশী ;—
আঁধার অলকে মালিকা রয়েছে খসি।
সেদিন কাহার আনন স্মরিনু নব জনমের তীরে।
ঝরা বকুলের সৌরভ সে কি কোটি-জনমের আগে?

সৌরভে সুরে মিশে-মিশে সে যে হয়ে যায় একাকার।
তারি সংগীত রচিনু বসিয়া আঁধার আকাশ-তলে।
মনে হল মোর জনম-স্রোতের পারে
একদিন শুধু লুকায়ে দেখেছি তারে।
নব-নব পটে সেই ছবি আঁকি আতুর আঁখির জলে।
ব্যাকুল মরণ-উদধি ঘিরেছে বারে-বারে চারিধারে।

দু-হাতে সরায়ে স্মৃতির আঁধার সেই সে যুগের পারে,
পথেরি মায়ায় একাকী চলিনু সুদুর স্বপন-দেশে।
নির্ঝর-গানে হিম হয়ে যায় দেহ,
সারা প্রাণে মোর ঘুচে যায় সন্দেহ ;
সেই ঝাউ-বন-ছায়ার ওপারে আসিনু পথের শেষে।
বিরহিণী বীণা বাজে শুনি কার কোটি-জনমের পারে!

সে কি সুরে-সুরে শুধায় আমায়, 'তুমি যে এসেছ পথে!'
কান পাতি শুনি কাঁদে ঝাউবন দেবদারুসনে মিশি।
আবার শুনিনু, 'তুমি যে এসেছ পথে ;—
এ বন-ভবনে আমি আছি কোনোমতে।
বীণারে সাজাই অশ্রুর হারে ; সাথে জাগে মোর নিশি!
বাতায়নে তব বারতা পাঠাই অলক্ষ মনোরথে।'

'আজি কি তোমার মনে পড়ে প্রিয়, সেদিন বরষা-রাতি।
তোমারি লাগিয়া বাহিরিনু পথে অভিসারিণীর বেশে ;
      চরণ-নূপুর বেজে যায় পথে-পথে।
      সুপ্ত নগরী ; শিথিল শিথান হতে
কেহ জাগে নাই। বন-বিহারিণী কুরঙ্গীসম শেষে
তোমার ভবন-দুয়ারে আসিনু। জ্বলিলো বাসর-বাতি।'

সহসা চকিত মরমে আমার জ্বলিলো স্মরণ-শিখা।
—নব বারি-ধারে সিক্ত কপোল ; শীতল সে তনুখানি ;
      নূপুর বিমরি আসি সে বরষা-রাতে,
      ভীত হাতখানি রেখেছিলো মোর হাতে।
কুলায়-শরণা বিহগীর মতো কহি অস্ফুট বাণী
কণ্ঠে জড়ালো বাহুর মালিকা—যেন নব শেফালিকা!

কাঁদে ঝাউবন অসহ ব্যথায়। দেবদারু দুলি মরে।
স্তব্ধ নগরী। পথে-পথে কার বাঁশরি ঝুরিছে ফিরে।
      আজো মনে হয় কোটি-জনমের আগে,
      সেই সেদিনের স্বপন নয়নে লাগে।
মনে প'ল কার চুমিনু অধর প্রখর শিপ্রাতীরে।
সে যেন আজিকে নীরবে এসেছে মোর বাতায়ন 'পরে।

কহিছে সে যেন, 'হায়-হায় কবি, আজো কি পড়ে না মনে-
সেই নদী-তীর, নারিকেল-বীথি, শুভ্র পথের রেখা!
      নব দূর্বার আসন বিছানো ঘাটে।
      তারি 'পরে বেলা প্রহরে-প্রহরে কাটে।
সোপানে-সোপানে অতুল চরণে নামিত কে একা-একা!
কলসে-কাঁকনে বাজিত মধুর—পড়ে না কি তারে মনে?

মনে প'ল মোর গোধূলি-ধূসর প্রদোষ-তিমির-তলে,
কে যেন কাঁদিছে নত করি মুখ বেদনা-শিখায় জ্বলি!
      দু-হাতে তুলিতে কাতর সে মুখখানি,
      জাগে মনে হায় কোটি-জনমের বাণী।
ম্লান দীপালোকে মনে হল আজ এসেছি কুসুম দলি!
ঝলসি উঠিছে আনন কাহার তপ্ত বিরহানলে।

এই ধরণীর শ্যামল ধুলায় সে যে বধূ হল মোর।
কতদূর হতে ভেসে খসে এল একটি করুণ অণু।
      লাল চেলি পরি এল সে জীবন-সাথী।

আঁচল-আড়ালে আনিলো বাসর-বাতি
আনিলো মধুর বাসনা-সোহাগ মীনকেতু-ফুলধনু।
ম্লান দীপালোকে পরশি চিবুক ভুলি জীবনের ডোর।

আজিকে উতল পথের বাতাস হেনা-সৌরভ লুটে।
মনে হয় আজি বাঁধা প'ল প্রাণ শত জনমের কাছে।
যে কথা ভুলেছি কোটি-জনমের আগে,
আজো সেই বাণী বাসনা-পরশে জাগে।
চুম্বনে যবে অশ্রু মুছাই, ভাবি ভালোবাসিয়াছে.
গতদিবসের প্রীতি-বন্ধন স্মৃতি হয়ে জেগে উঠে।

তাই বসি-বসি স্বপন দেখি যে শ্যামা ধরণীর কোলে,
উৎসব-শেষে মালিকার মতো ম্লান হয়ে উঠে মন!
গগনে-গগনে যারা করে কানাকানি,
তারা নিয়ে আসে জনমান্তর-বাণী।
সুরের সুধায় সৌরভ মিশে,—মনোহর জাগরণ।
ভবন-বলভি-শিখরে তাহার মুরতি পরানে দোলে।

পথ-মায়া

পথিক-হৃদয় ধীরে-ধীরে কয়, যোজন পথের শেষে
ফেরো কার উদ্দেশে?
শীত-নির্ঝর গীত গেয়ে যায় ; রৌদ্র মলিন হেসে
শুধায় আমায়, কার তরে ফেরো এমন উদাস-বেশে!
খুঁজে নাহি পাই কথা ;
ভাবি মনে, একি অকারণ আকুলতা!
গোপন মরমে ক্ষীণ বাণী রহে জাগি—
পথ চলি হায়,—উদাসী বিধুর প্রেয়সী নারীর লাগি।

প্রতিটি দিনের বেদনা শুধায়—জীবন আঁধার হলে
কারে চাও পলে-পলে?
নীরব গহন বনতলে চলি ; মন যে চলে না আর :
সবে ডাকি কয়, পরান ভরিয়া কেন এত হাহাকার!
যারে চাও, তারে লহ—
নিঠুর বেদনা কেন বা এমনে বহ?

সারাটি হৃদয়ে এক বাণী রহে জাগি—
পথ-চলা মোর সুদূর মধুর প্রেয়সী নারীর লাগি।

চারিপাশে জাগে মহাকলরোল ; জীবন-তটিনী ঘিরে
কালের নটিনী ফিরে।
মৃদুভাষে তার ব্যথা ভোলে প্রাণ, তবু যেন সে কি চায়
ঘরের উদাসী ঝড়ের দোলায় পথে-পথে বাহিরায়।
কাঁপে দেহ-হিন্দোল ;
অন্তর আজি উতরোল-উতরোল!
ধ্রুবতারকার প্রভা তবু রহে জাগি—
শত বন্ধন-ক্রন্দন মাঝে প্রেয়সী নারীর লাগি!

আতুর হৃদয় ধীরে-ধীরে কয়. আজি বেলা হল শেষ ;
বিফল সুরের রেশ।
গগনে-গগনে জ্বালা নাহি রবে ; সন্ধ্যা ধূসর-দিন।
ঊষর মরুর শেষের সীমায় বাজিবে জীবন-বীণ ;
শূন্য সে পথ 'পরে
দীর্ণ হিয়ার বেদনা ঘুরিয়া মরে!
মধ্যমণি সে বাসনা রহিলো জাগি।
পথ চলি হায় উদাসী বিধুর প্রেয়সী নারীর লাগি।

লতাময়ী উর্বশী

(বিক্রসোর্বশী)

কুমার-কানন-তলে উর্বশী সে—স্বর্গের অপ্সরা,
সুকঠোর অভিশাপ-লীনা।
নন্দন-বনের ছায়ে প্রিয়াহারা ফিরে পুরূরবা,—
অশ্রুম্লানদৃষ্টি, উদাসীন। মিলনের স্তব্ধ বীণা,
শূন্য শয্যা, দীর্ঘতরা চন্দ্রিকা রজনী,
শুষ্ক শীর্ণ সুগন্ধি মালিকা,
প্রেমভাষা-গুঞ্জহীন পরিচিত বকুল-বীথিকা
স্বপ্নসম ভাসিছে অন্তরে। ফণী যেন শিরোমণি
ফেলেছে হারায়ে। তন্দ্রাহতা বিশীর্ণ-পল্লবা,
অরণ্যবল্লরী প্রিয়া, নহে-নহে চিরমধুক্ষরা।

মায়ার উর্বশী সে যে, কভু ফিরে উষার আননে,
ধূসর রক্তিমবাসা পূর্বাকাশতটে ;
মহেন্দ্র-বাসরে কভু স্তনাংশুক-শরম হারায়ে
নৃত্য করে ছন্দোময়ী, ফাল্গুনীর প্রেম-ভিখারিনী,
মদির-লোচনা নারী। আজি মর্ত্যে তাহার নয়নে
বিচ্ছেদের প্রেমবারি ধীরে-ধীরে তুলিলো দুলায়ে
সে কোন্ মায়াবী নর? তাই সে যে লতা—সঞ্চারিণী,
শিশির-মার্জিততনু, কাননের শ্যাম চিত্রপটে
লীলাময়ী উঠেছে ফুটিয়া।

স্তব্ধ ঘন কুমার-কানন,
বিহগ ফিরিছে একা, প্রিয়া নহে চক্ষুর গোচরা।
করুণ রোদনে তার মাঝে-মাঝে কাঁপে বনস্থলী!
পুষ্প নাহি—ফল নাহি ; বিরহের দীর্ঘশ্বাসভরা
তপঃক্লিষ্ট বনস্পতি। প্রেমভাষা ভুলেছে সকলি ;
শুধু রুদ্ধ অন্ধকার হোমধূমে পুঞ্জিত গগন।

সেথা সর্বসীমন্তিনী লতা হয়ে মেলিছে পল্লব ;
অপূর্ব মুকুল-স্তন-স্তোক-নম্রা, সুপর্ণ-গুণ্ঠিতা—
তনুর লাবণ্যমধু শ্যাম শোভা দিলো বিস্তারিয়া
সর্ব অবয়বে তার। সেথা আজি তুলে কলরব,
বিশ্বের বিরহী যত। ব্যথাতুরা নীরব-কুণ্ঠিতা
সঙ্গচারিণীর দল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ;
কভু আর্দ্র পত্রদল মেলে
ইঙ্গিত জানায় ধীরে সমীরের পরশে দুলিয়া।

সে ইঙ্গিত-মর্মকথা গন্ধবহ উদাস নিঃশ্বাসে
বহি চলে দেশান্তরে নদী-গিরি-কন্দর লঙ্ঘিয়া
তৃণে-তৃণে পরশ বুলায়ে। সর্বব্যাপী ছায়া তার
মুছি লয় সন্ধানের আলোকের রেখা। ব্যথাভার,
অন্ধকারে ফেনায়িত সমুচ্ছল নীল সিন্ধুসম
উঠে তরঙ্গিয়া!
শান্ত অনুপম
প্রিয়ার মোহন ছায়া সুদূরের সুনীল আকাশে,
ক্লান্ত নেত্রে ক্ষণিকের দাহ পাসরিয়া
হেরে ধীরে প্রতিষ্ঠান-পতি।

তমাল-বনের ছায়ে,
শ্যাম পত্র-পল্লবের 'পরে, উষার মৃদুল বায়ে,
কুসুমের সুষমা-সম্ভারে প্রিয়ার আননখানি
দীর্ঘদিন গিয়াছে মিশিয়া।
সন্ধানী বিরহী আজি রহস্যের আঁধার ভেদিয়া
হেরে সবি প্রিয়াময় ; সর্বহারা খুঁজে পেল বাণী।

তারপরে একদিন বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
মৃত্তিকার দেহ 'পরে চঞ্চলের চলিলো ক্রন্দন।
ব্যথাতুর পুরূরবা হেরে দূর কুমার-কাননে
প্রিয়া যেন লতা হয়ে দোলে—
নিবিড় সুষমা-মাখা। প্রসারিত করতল 'পরে
ঝরিলো মঞ্জরী দুটি। দুই বিন্দু অশ্রু থরে-থরে
শোভিলো মণির মতো। প্রেমভাতি জাগিলো নয়নে
অম্লান কোরকে তার রাখি দিলো প্রথম চুম্বন
আদি নর, আদিম বিরহী।

বাহিরিয়া এল নারী,
লতিকার শ্যাম দেহ ছাড়ি।
বেপমান তনুখানি শোভে যেন কোরকের মতো।
শ্যামলী, সুন্দর-দেহা ; সারা পৃথ্বী স্তবগান-রত!
দুটি কর্ণমূলে তার। প্রসন্ন আননা
চাহিলো ফিরিয়া ধীরে মায়াস্তব্ধ প্রিয়ের আননে।
বারেক চাহিলো ধীরে স্মিতহাস্যে নগ্ন দেহ 'পরে,
পদ্মরাগ-রক্তিম উরসে। তারপরে দেহ ভরি
তুলিয়া তরঙ্গখানি, ফিরে এল ত্বরিতগমনা
প্রিয়ের বাহুর পাশে। শরমের নিগড় পাসরি
আলোকের শুভ্র বন্যা ছেয়ে গেল সারাটি ভুবনে
বিধাতার আশীর্বাদসম!
উঠে জাগি থরে-থরে
সৃষ্টির প্রথম পুষ্প পূর্ণ দুটি অন্তরের মাঝে।
বিধির নবীন গান দুটি দেহ-বীণাযন্ত্রে বাজে।

তিলোত্তমা

নব-নবতর রূপে বিধি তোমা সৃজেছিলো জানি
আপনার মন-মতো করি।
ধরার শ্যামল অঙ্কে মরণের দীপালি-উৎসবে,
সে রূপ হেরেনি কেহ। মৃত্যুর অতীত মহাবাণী,
নবীন মোহিনীমন্ত্র দীর্ঘায়ত নয়ন-পল্লবে,
চিক্কণ চিকুরজালে বজ্রগর্ভ মেঘচ্ছায়াখানি
জ্বালাময়ী রূপবহ্নি বিশ্বধাতা মহাধ্যানে ধরি
অর্পিল তোমারে।

কত মাস-বর্ষ-দিন
গত হয় মৃত্তিকার ধরণীর বুকে!
অশ্রুর আষাঢ় আসে বিরহের আর্ত অন্ধকারে
মর্ত্য-মানবের নেত্রে। জানি তব গর্বোজ্জ্বল মুখে
নাহি সে বিষাদ-রেখা। সুধাস্নাত নির্মল ললাটে
বিচ্ছেদ-শঙ্কার ছায়া লিখে নাই মলিন লিপিকা।
শান্ত, দূর-প্রসারিত মাঠে,
প্রভাত-সঞ্চারসম,—অনাদির ইঙ্গিত-গীতিকা
সুনবীন নগ্নদেহা উঠেছিলে ফুটে!

আজি ধরা একান্ত প্রবীণ ;
কত গান, কত হাসি রুদ্ধ হল অশ্রুজলধারে।
কত রূপ, কত রস ম্লান হল, শুষ্ক হল ধীরে ;
আজো যেন মনে হয়, আছ তুমি মন্দার-মালিকা,-
অম্লান নন্দন-গন্ধা। বক্ষতল-কমল-কলিকা
আজো নহে পূর্ণ বিকশিত। মন্দাকিনী-তীরে-তীরে
যৌবন-বিকাশছন্দে কমনীয় তনুর সম্ভারে,
মহাকাল-ভ্রূভঙ্গিরে ফেরো উপেক্ষিয়া!

গগনের শশী,
তোমার মুখের 'পরে চাহি রহে নিমেষবিহীন।
তারাদল,
অনন্ত আকাশ 'পরে তারুণ্যের বেদনা-বিহ্বল!
যেন রাত্রি-দিন
প্রস্ফুট ওষ্ঠের বাণী চাহে শুনিবারে ;
সুচির-মৌনতা তব তুলে চঞ্চলিয়া

নিখিলের জীবস্রোত। তব প্রেম অতল-পাথারে
দিশাহারা কোটি-কোটি প্রাণী।

হেরে কবি, অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি
সাগর-তরঙ্গসম ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ চঞ্চল জীবন ;
অঙ্গের সুরভি তব, মুকুলিত অনন্ত যৌবন,
স্মিত হাসি, রক্ত বিম্বাধর,
বিশ্বব্যাপ্ত, মহামোহে আন্দোলিছে দিক্‌দিগন্তর।
বাণীহীনা, দীর্ঘ দিন হেরিতেছ সন্নত নয়নে
যুদ্ধ চলে তোমা লাগি দেশে-দেশে গৃহের প্রাঙ্গণে

পুঞ্জ-পুঞ্জ মৃতস্তূপে ছেয়ে যায় বিরাট ভুবন!
সংগ্রাম-সংক্ষোভে তাই সুভীষণ শবের মাঝারে,
জয়ী-জন—নতজানু নিপীড়িছে তব কটিদেশ!
ভঙ্গিহীন, রেখামুক্ত, চির নব বেশ,—
অকম্পিতা, মাল্য দাও তারে ;
নীরবে বন্ধুর-দেহা ফেরো গৃহে সুমৌন-আনন!

জানি তুমি
প্রিয়তম-করতল চুমি
শ্যামলী-লতিকাসম শোভ নাই সংসার-প্রাঙ্গণে,
নব স্নেহাঞ্জনে
নয়নের দৃষ্টি তব ছায়াসম নহে যে কোমল ;
শিশুর কাকলি-গান পশে নাই তোমার শ্রবণে,
আজি হেরি ধরার অঙ্গনে
সহসা উঠেছ জাগি দীপ্তি-ঝলমল,—
রৌদ্রলীলা, কালানল-শিখা,
বিশ্রাম-রাত্রির ভালে রক্তময়ী পূর্ণা বিভীষিকা,
সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী রানী!
নহ শুধু কামনার পদ্মদলাসীনা,
কল্পনা-স্বরগতলে চিরস্থিরা নহ গতিহীনা
নহ যে কল্যাণী!

যোদ্ধার হৃদয়-লীনা, সৈনিকের জয়লব্ধ ধন,
চিরমৌনা, আজি হেরি তোমা লাগি চলিছে লুণ্ঠন
ধরার অঙ্গনতলে ; আনো অমা ; নহ তাই রমা—
ধাতার অপূর্ব সৃষ্টি রক্তস্বরা সুর-তিলোত্তমা!

রমা

সাগর-মন্থন-দিনে বিক্ষোভিত সিন্ধুবক্ষতলে,
সুরাসুর-বাসনার বিহসিত শ্বেতাম্বুজ-দলে,
আরক্ত পল্লব-পদ সমর্পিলে কবে?
আজি ভাগ্যনভে
করাল প্রলয়-ঘন ছেয়ে যায় বিস্তৃত আঁধার!
দারিদ্র্যের বিভীষিকা, আতুরের আর্ত হাহাকার,
অজস্র শোণিতপ্লাবী লৌহবাহু নব সভ্যতার
আস্ফালন-মন্থনের রক্ত-মহোৎসবে,
অয়ি রমা, দাঁড়াইবে জীবনের ক্ষতের আহবে,
শান্ত স্মিত মুখে,—
প্রলুব্ধ, রয়েছি বসি দিন গণি স্পন্দমান বুকে।

চঞ্চলা, আজিকে তব অঞ্চলের ছায়াস্পর্শখানি
কোথায় মিলায়ে গেছে পাণ্ডু রৌদ্রে আপনায় টানি!
জীবনের স্তরে-স্তরে রেখে গেছে তার
অভাব-ধিক্কার!
চেষ্টা তবু রয়ে গেছে, প্রাণপণ ভীষণ প্রয়াস।
ক্ষুধার সংগ্রামে তার পলে-পলে হল সর্বনাশ!
মরণ-সাগরমাঝে বেদনার ফেনিল উচ্ছ্বাস
আঘাতে-আঘাতে তবু শেষ নাহি হয়।
ফিরে-ফিরে আসে জানি রোগ-শোক-নিন্দাগ্লানিময়
মৃত্যুশীর্ণ ভবে;
অয়ি রমা, দাঁড়াইবে জরা-ক্ষয়-ক্ষীণতায় কবে?

স্বর্ণগর্ভা ধরিত্রীর স্নেহশ্যাম কুঞ্জবনছায়ে,
হে ক্ষণিকা, ধীরে-ধীরে আপনারে দিয়েছ বিলায়ে;
হিরণ্য অঞ্চলটিরে দুলাইছ হাসি;
পুষ্প রাশি-রাশি
অমনি উঠিছে ফুটি প্রাচুর্যের নব আয়োজনে।
বিমুক্ত ভাণ্ডার দ্বার। লক্ষপ্রাণী আনন্দ-প্রাঙ্গণে
ছুটিছে ব্যাকুল বেগে—দিশাহারা প্রাণসন্ধিক্ষণে,
মহান কল্যাণবাণী উচ্চারিছে ধীরে।
পরক্ষণে হেরি সবে নতনেত্রে ভাসে অশ্রুনীরে।
ক্রন্দন-কল্লোল
দিগন্ত রণিয়া উঠে। ধ্বনি উঠে বেদনার রোল।

বিচিত্রা, আজিকে তব নানারূপে পেয়েছি সন্ধান,—
হিরণ্ময় প্রেমপাত্র প্রেয়সীর চির মধুম্মান,
স্পর্শ রাখে রোগতপ্ত ললাটের 'পরে।
কত স্নেহ-ভরে ;
জননীর শান্ত নেত্রে হেরিয়াছি তোমার প্রকাশ।
পেয়েছি বেদনা-ক্ষতে প্রলেপের সুস্নিগ্ধ আভাস।
নারীর কোমলবক্ষে বাঁধিয়াছ মৌন সুপ্ত বাস,
পালনের সুধা বহ দিগদিগন্তর—
কমলা, তোমার স্পর্শে শ্যামশষ্পে ভরিছে প্রান্তর!
এ বিশ্বের অমা,
ভবিষ্য-সাগর-মন্থে নাশি কবে দাঁড়াইবে রমা?

মৈত্রেয়ী

প্রশান্ত প্রভাতে আজি বিহগের কাকলি-কল্লোলে
হে কল্যাণী নারী,
তোমাব নির্মল শান্তি, গ্লানিহীন স্নিগ্ধ আশীর্বাদ
আনন্দ বিথারি
পূর্ণ করে জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি-ভাবনা-লাঞ্ছনা ;
মুক্ত নীলাকাশে,
জ্যোতির্ময়ী-বেশে আজি দাঁড়ায়েছ সম্মুখে আমার
—নেত্রে দীপ্তি ভাসে।

সে কোন্ আদিম যুগে অরণ্যের হোমপূতছায়ে
সদ্য বর্ধমান
সুনবীন সভ্যতার ক্লেদরিক্ত নির্মল প্রাঙ্গণে
তব পুণ্য গান
উঠেছিলো নাহি জানি—পূর্ণতম সাধনার বাণী
আপনার বেগে!
সে জ্ঞান-সাগর-তীরে তুমি নারী ছিলে উর্দ্ধমুখে
দীর্ঘরাত্রি জেগে।

নিদাঘ-জড়তা-শেষে নীল নভে প্রাণবারি-আশে
চাতকের-সম,
সংসার-মরুর পথে অমৃতের সুতীব্র পিপাসা—
কমনীয়তম,

নীরবে বহিয়া ধীরে ক্লান্তপদে সগৌরব-শিরে
অয়ি তেজস্বিনী,
নারীর মহিমা-বাণী মুক্তকণ্ঠে করেছ প্রকাশ
অজ্ঞান-নাশিনী!

চাহ নাই ধনজন যশমান বিভব-বিলাস
জীবনের পথে ;
বিরাট অতৃপ্তি তব বুভুক্ষিত ক্ষুদ্রবক্ষোমাঝে
ছিল কোনোমতে ;
অঙ্কুর-জনম-শেষে সংসারের বস্তুর সম্ভারে
মাথা করি নত
রহে নাই। বহে নাই জীবনের বিপুল গ্লানিরে
নীরবে সতত।

ব্রহ্মজ্ঞানছায়াতলে প্রাণগতি এনেছ বহিয়া
হে প্রদীপ্তা নারী,
পরিপূর্ণ প্রেমবলে মুক্তবাণী করেছ প্রচার
সৌন্দর্য সঞ্চারি!
মানুষের রোগক্ষীণ ব্যথাদীর্ণ পঞ্জরের তলে
চিরন্তন বাণী
আপন জীবন দিয়া শান্তনেত্রে মেগেছ নীরবে
হে চিরকল্যাণী!

সরস জীবনরূপ কঙ্কালের রিক্তবক্ষ-মাঝে
হয়ে যায় শেষ।
ঝরে ফুল ; পড়ে পাতা ; আসে মৃত্যু দীর্ঘছায়া ফেলি-
নাচে যে মহেশ!
এ চির-মৃতের বুকে অমৃতের আনন্দ-উৎসব
তব ধ্যানলোকে
ফুটেছিলো ধীরে-ধীরে। করেছিলে মানস-সন্ধান
অসীম পুলকে!

আজিকে তোমার রূপ ভারতের নারীশক্তি-মাঝে
হে তাপস-রানী,
হেরিতেছি ধ্যানে মোর,—প্রভাতের আনন্দ-আলোকে
ধীরে দিলে আনি।
অপসারি জড়তার গতিহীন ব্যর্থ স্তূপভার
সত্যের আলোকে,

সে শক্তি উঠিবে জাগি মহারাজ-রাজেশ্বরী-বেশে
পলকে-পলকে।

প্রাণহীন অবরোধ, শুচিহীন গুণ্ঠনের তলে,
সংকীর্ণ জীবন,
জ্ঞানহীন রুদ্ধগতি টানি চলে শীর্ণ দেহভার
বরিতে মরণ।
পঙ্কিল প্রাচীর ভেদি পশে নাই দীপ্ত সূর্যালোক ;
রোগ-বীজাণুর
ক্ষমতা বাড়িয়া চলে। চলে ধীরে তাণ্ডব নর্তন
উদ্দাম স্থাণুর।

সে মহাপ্রকার 'পরে জীবনের উন্মুক্ত কল্লোল
বাধাবন্ধ টুটি
আসিছে—হেরেছি তার মহোদ্দাম সুন্দর স্বরূপ
উঠিয়াছে ফুটি।
প্রখর পিপাসা তব রৌদ্র-দীপ্ত সিন্ধু-সিকতায়
খুঁজিয়াছে পথ।
আজিকে টুটিছে বাধা—ঘুচে যায় মোহ-জড়তায়
অচল পর্বত।

সত্যজ্যোতি-অমৃতের দীপ্ত বাণী করেছ সন্ধান ;
পেয়েছ উদ্দেশ।
আত্মার আলোকে তারে বিশ্বমুখী হেরেছ নীরবে ;
ক্ষয়-ক্ষতিলেশ
সহ নাই। রহ নাই প্রেমহীন অচল বন্ধনে
অয়ি জ্যোতির্ময়ী,
নিশ্চল তিমিরমাঝে আলোকের মুক্তবাণী কহ—
প্রেম—চিরজয়ী।

বর্ষা-সখা

হে গম্ভীর,
আজি হেরি নভতলে তব বেগ,—উদ্দাম, অধীর।
একান্ত নিঃশব্দ তব পুঞ্জ-পুঞ্জ বিপুল সঞ্চার
সুকৃষ্ণ নিবিড় ঘনে ছেয়ে দিলো অম্বর-আঁধার!

তিমির-রাত্রির মাঝে দিগঙ্গনে ডম্বরু তোমার
প্রাণে মোর ধ্বনে অনিবার।

আমার পরান-শিখী আজি হেরি করিছে নর্তন ;
তব গুরু-গরজনে বনে-বনে নামিলো বর্ষণ ;
দেবদারু-তরু-শিরে প্রাসাদের শিখরে-শিখরে
বিপুল ঝঞ্ঝার বেগে কলশব্দে ঝর-ঝর ঝরে ;
সুদূরের শ্যামসীমা লুপ্ত করি শব্দিত সঙ্গীতে,
বিরাট এ স্বপ্নপুরী মুছি দিযা একটি ইঙ্গিতে
নেমে এল তব অনুচর ;
প্রাণে যে ফুটিল কেয়া, মেতে উঠে অন্তর-প্রান্তর!

নীলাভ্রের আঁখি 'পরে টানি দিলে সুশ্যাম অঞ্জন
নয়ন-রঞ্জন!
বিচিত্র এ ধরণীর নানা দ্বন্দ্ব-শ্রান্ত কোলাহল
একটি নিমেষ মাঝে মুছে দিলে ; করিলে নির্মল!
আমার এ হিয়াখানি মুছে দাও প্রার্থনা আমার ;—
হে বাদল উদ্দাম, দুর্বার!

ক্লান্ত নগরীর বুকে বহে তীব্র পূরব-বাতাস—
যেন তব ব্যাকুল নিশ্বাস!
হে প্রেমিক, শ্রান্ত বড়,—চিত্ত মোর তৃষায় বিকল!
কমণ্ডলু হতে তব ঢালো-ঢালো করুণা-শীতল
সরস, সরল, স্নিগ্ধ শান্তি-বারিধারা!
নীর-সমরোহমাঝে আমি আজি হব দিশাহারা!
ধরারে করিছ শ্যাম প্রাণদাতা তুমি হে বাদল!
শ্রান্তিহীন তাই অবিরল
চলে তব সৃষ্টিলীলা পল্লবের কোমল জীবনে।
তাই ক্ষণে-ক্ষণে
মোদের কঠোর চিত্তে লাগে তব চকিত পরশ,
অমৃত-সরস!

কার আশীর্বাদ-রূপে নিত্য তুমি ঝরিছ দেবতা
শুনি কার কথা,
তোমার কর্মের পথে বার-বার আসিছ একেলা!
খেলিতেছ চিরন্তনী খেলা!
তাহারি কোমল স্পর্শ আজি যেন করি অনুভব।

প্রশান্ত নিশীথে তাই নিস্তব্ধ, নীরব
বসে আছি বাতায়ন-পাশে!
তুমি আজি সঙ্গী মোর ; আজি তাই ভাসে
তোমার সংগীতধ্বনি অন্তরে আমার।
আজি প্রিয়, চিত্ত মোর তব সাথে করে নমস্কার।

শুক্লা একাদশী

আজি তুমি এসো মোর পাশে!
ক্লিষ্ট আঁখি-পাতে মোর সুরভি-নিশ্বাসে
বিশ্রাম নামিয়া আসে সুকোমল পরশে তোমার।
তাই আজি কহিতেছি, কথা কও, এসো একবার,
এসো পাশে, এসো প্রাণে, এসো মোর সকল জীবনে,
বেদনা-বন্ধন টুটি ধীরে এসো মনোবাতায়নে!

ওগো শুক্লা রজনীর একাদশী তিথি,
হৃদয়-প্রাঙ্গণ-তলে তুমি মোর প্রশান্ত অতিথি।
মুদে আসে শ্রান্ত আঁখি। নবীনের আবাহন নাহি।
আমারে করিও ক্ষমা। এলে যদি চিত্ত-তট বাহি,
বাহিরে আসিলে ধীরে রূপ ধরি মলিন আলোকে,
কহ তবে, অকারণে, কিসের পুলকে
কাঁপে প্রাণ, কাঁপে দেহ, টুটে আসে মোহমায়া-ঘোর
মনে হয় ছিন্ন করি ধরণীর স্নেহ-বাহু-ডোর,
কোথা যেন যাব চলি!
বিদায়-বিষাদ-শিশু বহে তাই বেদনা-অঞ্জলি!

কত কাল, কত দিন ধরে,
হে পথিক, চেয়ে আছি অনন্ত তোমার পথ 'পরে।
বক্ষ মোর দুলে উঠে ভয়ে ;
চিন্তা যায় কোন্ বাণী কয়ে,—
মনে হয় হবে দেখা—
এমনি স্বপন-রাতে রুপালির রেখা
চিত্তে মোর হবে আঁকা! ছিলো মোর জানা,
আসিবে দিগন্ত ব্যাপি ; দুটি স্নিগ্ধ সুকোমল ডানা

প্রসারিবে ধীরে-ধীরে,—সন্ধ্যা যেন শ্রান্ত পৃথ্বীতলে—
হে মৌন সুন্দর জ্যোতি, স্পর্শ দিবে চিত্ত-শতদলে।

কাঁপে প্রাণ দীপশিখা-সম ;
তোমার আননে চাহি নিদ্রা নাই নেত্রপ্রান্তে মম।
এ কী ব্যাপ্তি! এ কী শান্তি! কী প্রসার, কী মহিমা-ছায়া-
অপূর্ব বিরতি-মাঝে সুমহান সান্ত্বনার কায়া!
নাহি জানি কি যে তার ভাষা—
প্রতিক্ষণে সুর তার প্রাণে মোর করে যাওয়া-আসা!

কোথাও বন্ধন নাহি, দৈন্য নাহি, নাহি চিন্তা-লেশ ;
অনায়াস-মুক্তগতি যেন লঘু চীনাংশুক-বেশ!
ছেয়ে যায়, ভেসে যায়—দিয়ে যায় শান্তিরস-ধারা!
বর্ণ-গীতিরেশ আনে। তাই মোর চিত্ত হল হারা
তোমার সঞ্চার-মাঝে হে উদাসী, শুক্লা একাদশী,
আকাশ-প্রান্তর-তলে কোন গান গাহো একা বসি!

আজি তুমি এসো মোর পাশে,
গুঞ্জরিয়া কহ ধীরে বসন্তের বিদায়-বাতাসে,
কহ মোরে, বাসি ভালো ধরণীর শ্যামাবগুণ্ঠন,
দিশাহারা প্রসারের তাই আছে চকিত বন্ধন,
বনানীর পুঞ্জ-পুঞ্জ তরুবীথি-শিরে।
তাই পৃথিবীরে
নীরবে আবরি রহি। কহি কত কথা—
অর্থহীন কলোচ্ছ্বাস প্রণয়-মত্ততা
নাহি তায়—শুধু আছে ধীরে সঁপে দেওয়া
আপন সর্বস্ব দিয়ে প্রেমিকের প্রসন্নতা-নেওয়া!

তাই আজি চেয়ে আছি। হে চন্দ্রিকা, অয়ি বিমলিনা
চেয়ে তব মুখ-পানে, আজি আর বলি না-বলি না,—
নাহি প্রেম, নাহি শান্তি! পেয়েছি নির্ভর,
হৃদয়ের যাত্রাপথে নাহি মরু উষর, ধূসর!

চোখ গেলো

চোখ গেলো কার, কোন সে জনার,
কেমনে চিনিব তারে?
সে কি অশরীরী—আসে ধীরি-ধীরি
মন-তটিনীর পারে!
সে কি বহি আনে রূপ-সাগরের তীরে,
বিফল আশার বেদনা নয়ন-নীরে!
কোন্ ভাষা বলে বারে-বারে, ফিরে-ফিরে,
হৃদয়-কুঞ্জ-দ্বারে!
কেবা সেইজন—হারালো নয়ন,
কেমনে জানিব তারে?

মুহু কুহু-ভাষে, যে বিহগ আসে
মঞ্জু কুঞ্জ-তলে,
সে নহে এ-জন ; ইহার নয়ন
ভরিছে অশ্রুজলে!
যে আলো দেখেছে মেলিয়া নয়নদুটি
পক্ষ প্রসারি দূর মেঘলোকে উঠি,
সে আলো রয়েছে প্রাণশতদলে ফুটি—
ঝলকিছে পলে-পলে।
আলোক-পিপাসী উঠেছিলো ভাসি
জ্যোতি যেথা রহি ঝলে!

তাই আজি হায়, ঝলসিয়া যায়
আঁখিদুটি ধীরে-ধীরে।
নাহি-নাহি বারি—নির্মল ঝারি ;
তাই তো কণ্ঠ চিরে।
দূর গগনের সুদূর প্রান্ত হতে
ভাসি আসে সুর বিপুল ব্যথার স্রোতে ;
আঘাতি ফিরিছে মানব-মানস-পথে,
জগতের মন্দিরে।
সে রূপ-আভায় আঁখি গেলো হায়,
তাই তো কণ্ঠ চিরে!

অরুণের মতো এ যে অবিরত
আলোর বাসনা বহি

উঠিলো আকাশে ; কোন মহাভাসে
ফিরিলো নয়ন দহি!
দুর্বলপাখা বুঝি বা মরণ-ডোরে,
শান্তি খুঁজিছে রূপ-পিপাসার ঘোরে!
বিপুল গগনে আকুল নয়নলোরে
কাঁদি উঠে রহি-রহি।
নামে চোখে তার নিবিড় আঁধার।
লুপ্ত সুদূর মহী!

দিবস-প্রহর বাড়িছে প্রখর ;
বাড়িছে দহন-জ্বালা।
ক্লান্ত পথিক কোথা কোন্ দিক
তোমার পান্থ-শালা!
রূপের তৃষার আশা কি মিটিলো শেষে!
কেন ফেরো আজি শ্যাম তরু-গিরি-দেশে!
পরবাসে বলো কে পরালো তোমা হেসে
বিফল ব্যথার মালা!
হেরি আজি তাই, বিশ্রাম নাই
বহিছ বেদনা-ডালা!

চোখ গেলো যার, আজি সে-জনার
সন্ধান দিলো আনি
দীপ্ত দুপুর, দিবসের সুর,
ক্লান্ত ক্লিষ্ট বাণী!
সে নহে কেবল বিহগের ফিরে-আসা ;
দাহ-তাপ-মাঝে ব্যথিত-জনের ভাষা,
চির-দিবসের সকল গরব-নাশা
সে যে বেদনার বাণী—
চোখ গেলো যার সেই সে-জনার
সন্ধান দিলো আনি।

বারিহীন দেশে যেথা অবশেষে
মরুরেখা-পথ ধরি
যাত্রীরা চলে ধীরে দলে-দলে
মরুর তৃষায় মরি।
সেই সে-দেশের পাণ্ডু শূন্য-তলে
যেথা অহরহ অসহ আলোক ঝলে,

তুমি কি বিহরো সেই সে দীপ্তানলে
তৃষায় বক্ষ ভরি?
যাত্রীরা হায় কেহ ফিরে নাই
মরু-রেখাপথ ধরি!

সৃজন যেথায় শেষ হয়ে যায়
গগন-সীমায় দূরে,
অবিরত দাহে মন নাহি চাহে
যেথা যেতে ;—সেথা উড়ে
তুমি গেলে চলি তরুণ গরুড়-বেশে,
দাবদাহ-মাঝে অমৃতের উদ্দেশে ;
নয়ন হারায়ে আসিলে ফিরিয়া শেষে ;
মর্ত্যে মরিলে ঘুরে।
ফেরো বেদনায় তরুর ছায়ায়
চির-সকরুণ সুরে!

গেলো যার আঁখি নহে সে তো পাখি ;
সে যে আশা, দেহহীন।
ভাসে তারি সুর চিরসুমধুর—
প্রতি প্রাণতললীন!
যে আশা পারে না সহিতে বেদনা-রাশি,
পারে না হেরিতে স্নেহ-দয়া-মায়া নাশি
ধরণীর বুকে সুর উঠে তার ভাসি
সকরুণ উদাসীন
গেলো যার আঁখি, নহে সে তো পাখি,
সে যে আশা, দেহহীন!

শিশু

জীবন-যৌবন-ক্ষণে শিশু মোরে ডাক দিয়ে যায়!
অবিরাম ললিত কথায়!
স্বপ্নে মাতি দিবারাতি চলিয়াছি পথ হতে পথে!
উচ্ছল আনন্দ-বেগে তারুণ্যের দীপ্ত জয়-রথে ;
জয়-শ্রী ভাতিছে মুখে। কর্ম ডাকে সুকঠোর রবে।
গগনে-গগনে তার প্রতিধ্বনি জাগি উঠে যবে,

সহসা পড়িলো মনে, কবে কোন সুন্দর প্রভাতে,
ধরণীর বক্ষতলে শিশু হয়ে এসেছিনু ফিরে।
সে সুপ্ত শৈশব আজি ডাকে মোরে ধীরে,
সরল সুন্দর তার চিরন্তনী ক্রীড়ার সভাতে!

বহুদূর আসিয়াছি চলে,—
কভু হাস্যে, কভু ক্লেশে, যৌবনের কর্ম-সভাতলে!
জীবনের সিন্ধুনীরে ক্ষুধিত পাষাণ উঠে জেগে!
সরল সত্যের আলো ম্লান হল সংশয়ের মেঘে'
হে শিশু, কহিছ কেন, এসো এসো ফিরে!
আমার চটুল নৃত্যে যোগ দিবে নবীন মঞ্জীরে।
আমার এ খেলাঘরে ধূলিমাঝে স্তব্ধ মনটিরে
নীরবে রাখিয়া দিবে। আমি তারে ধীরে
আমার রক্তিম বাস পরাইব হেসে,
দিব মোর উত্তরীয়, পুষ্পমালা বাঁধি দিব কেশে!

* * *

তখন লাগিত বড় ভালো,
প্রভাত-সন্ধ্যার লীলা, মেঘ কালো-কালো
অসীম রহস্য-ভরা! যেন স্বপ্ন-রাজপুরী হতে
মাতঙ্গ নামিত ধীরে। জলধারা ছড়াত মরতে!
নিবিড় জলদজাল শালবনে চলিত সবেগে,
বর্ষার নূপুরধ্বনি শুনিতাম অর্ধরাত্র জেগে।
শিশুর অন্তর জুড়ি কোথা হতে আসিত কেবল,
অপ্সর কিন্নর কত—ছায়ানৃত্য আনন্দ-চঞ্চল!

আমার সে স্বপ্ন-স্বর্গে আমারে কি লবে তুমি ডাকি?
ধূলিজাল ছিন্ন করি আমি সেথা দাঁড়াব একাকী
হে শিশু তোমার পাশে: নয়ন মুদিয়া রব ধীরে
সংসারের পারাবার-তীরে,
যেথায় খেলিছ সবে কোলাহলে বালুতটতলে,
সংশয়-অতীতপুরে জগতের রাজার মহলে
নিঃশব্দে পশিছ সবে ;—সেথা মোরে ডাকিবে কেমনে.
সে চির সরল লোকে গ্লানিহীন আনন্দ-ভবনে?

* * *

হেরিতেছি চাহি
তিমির সরায়ে দূরে আসিয়াছ সম্মুখে আমার।
ধরণী আনন্দময়ী। বায়ু ফিরে তব গান গাহি ;
কবি রচে তব কাব্য। শিল্পী তব তনু সুকুমার
অমর তুলিকা-পাতে রচিছে নীরবে ;
তুমি আসি কবে,
তাহারে পরশি গেছ কল্পনার নব গীতরবে!
চিত্রে তারে তিলে-তিলে মহাপ্রাণ সমর্পিতে হবে!

তোমার হাসির পিছে সহস্রের চেষ্টা মরে ঘুরি।
নিখিল মায়ের কোল জুড়ি
নীরবে হাসিছ কভু, কভু বা কাঁদিয়া পড়ো গলি ;
কভু টলি-টলি
আনন্দ-ভবনতলে ফিরিতেছ অস্ফুট ভাষায়!
পুরাতনে দাও আশা, আলো দাও জীর্ণ বসুধায়!

তোমাদের যাত্রাপথ 'পরে,
আমারে ডেকেছ আজি মুখরিত আনন্দ-আসরে ;
সূর্য সেথা আলো-দাতা ;—গাহে গান বৈতালিক-দল
চঞ্চরী চঞ্চল
চিত্রিত ডানায় তার বহি চলে স্বপ্নের সংবাদ ;
বায়ু আনে নিখিলের প্রাণভরা শুভ্র আশীর্বাদ।
কোটি-কোটি কবিজন তোমাদের লাগি
মহান মঙ্গলতরে দীর্ঘ রাত্রি রয়েছেন জাগি!
মোরে তারি পাশে,
হে মোর শৈশব-স্বপ্ন, ডাকিয়াছ মধুর সম্ভাষে!

আজি সর্ব অবদান ধীরে তাই ফেলিয়াছি দূরে ;
তোমাদের চকিত নূপুরে,
আমার এ স্তব্ধ প্রাণ বাহিরিলো অন্ধকার হতে,
সলীল, চটুল নৃত্যে আনন্দের সমুচ্ছল স্রোতে!

বিশ্ব-নর্তকী

আকাশ জুড়িয়া তারা নাচে!
লক্ষ কোটি গ্রহে-গ্রহে সৃজনের ব্যাকুল উল্লাসে,
বন্ধহীন আনন্দের পরিপূর্ণ অদম্য প্রকাশে,
অপূর্ব লীলায় দুলি বিরাট শূন্যের অবকাশে,
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিয়া কহে তারা আছে, আছে, আছে
মোদের আনন্দ-নৃত্যে সাবলীল দ্রুত ভঙ্গিমাঝে
প্রাণের প্রবাহখানি। নব-নব সাজে,
তরঙ্গ-বিভঙ্গে দুলি নাচে তারা, নাচে, নাচে, নাচে!

সে নৃত্যে আন্দোলি উঠে মহাশূন্যে অণু-পরমাণু ;
সে নৃত্যে প্রকাশবাণী প্রচারিছে শশীতারা-ভানু!
সে নৃত্যে উন্মাদ উল্কা ছুটে চলে অজানা-সন্ধানে
এক গতি, এক প্রাণ লয়ে। পথহীন নীরন্ধ্র আঁধারে
লঙ্ঘি চলে ছায়াপথ তীব্রবেগে শূন্য-পরপারে ;
তারপরে আপনার উত্তপ্ত প্রাণের অগ্নিবাণে
ধ্বংসনৃত্যে আপনারে ভস্ম করি ফেলে একেবারে।
জ্যোতির্হীন গ্রহান্তরে শুষ্কবালু-মরুভূ-মাঝারে।

নাচে তারা নাচে ;
পলকে-পলকে তাই ব্যাকুলিছে প্রাণসিন্ধু মোর প্রাণ-তটিনীর কাছে।
কি বাণী কহিবে সে যে, নাহি জানি, নাহি তার ভাষা!
উদ্দাম, উচ্ছল নৃত্যে আন্দোলিবে শূন্যতল,—এই ছিলো আশা।
আলোক-তরঙ্গে তাই রঙ্গে-ভঙ্গে গতি আসে ছুটে।
সপ্তবর্ণ-ইন্দ্রধনু মহালোক-সিন্ধুপারে পড়িয়াছে লুটে।
গোপন নৃত্যের বাণী বনস্পতি করে জপ আপনার ধ্যানলোক-মাঝে।
ঋতুতে-ঋতুতে তাই অরণ্য-দেবতা তারে লঘু-ঘন শ্যামপর্ণ-সাজে
নীরবে সাজায়ে তুলি আপন প্রকাশ-মন্ত্র কহে তার কর্ণমূল-তলে।
অসীম নর্তন-ছন্দে ধরিত্রী উঠিছে মাতি মন্ত্র শুনি পলে, পলে, পলে।

ধরণী জুড়িয়া এরা নাচে ;
সরস সুন্দর তনু দুলি উঠে অবিরাম প্রাণপূর্ণ বিকাশ-লীলায়।
দুলে উঠে চন্দ্রহার। কটি-তটমালা নাচে। রূপ-মাঝে রূপ মূরছায়।
কনকরতনকাঞ্চী ক্বণি উঠে মুহুর্মুহু—কভু যায় দূরে, কভু কাছে।
ধরণী-নর্তকী নাচে। চাহি রহে লক্ষ নেত্র। নাচে এরা নাচে, নাচে, নাচে।

শত লক্ষ লৌহবাহু মেলি
নগর-দানব নাচে কর্মের গর্জনক্ষুব্ধ পথে।
নাচে রথ। নাচে ধূলি। প্রাণের প্রচেষ্টা কোনোমতে
ব্যগ্রবাহু প্রয়োজনে আবরিয়া চলে। দূরে ফেলি
পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ, বিপুল নর্তন-ছন্দে স্বার্থনটী ধেয়ে চলে দূরে।
মৃত্যু ভীষণরূপে কাঁদে পথ, উপপথ, ক্লান্ত, ব্যগ্র, ক্ষুধাদীর্ণ সুরে।

প্রকাশ-পশ্চাতে হেরি আনীল পিঙ্গল জটাজাল,
ধূলিধূম্র রক্তনেত্র দণ্ডধর মরণ ভয়াল,
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ঘোর কৃষ্ণ ব্যগ্র মেঘসম
চাহি রহে দৃষ্টির অতীত শূন্যপানে। ভাবি মনে,
নৃত্য হেথা ছন্দোহীন। আর্ত তীব্র ব্যাকুল চিৎকারে
বিশ্বের ধ্বংসের শিখা ভস্ম করে কমনীয়তম।
নিখিলের শ্মশান-প্রাঙ্গণে
ব্যর্থতার রুদ্র রূঢ় ব্যঙ্গ হাসি নৈশ অন্ধকারে
আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুতের কষার প্রহারে।

তবু, মৃত্যু ঘেরি তারা নাচে।
অসীম রহস্যলোকে সীমার বাঁশরিধ্বনি উঠে।
মনে হয়, মৃত্যু নাহি। যারে হেরি, মৃত্যু সে তো নহে।
গম্ভীর আসন্ন ছায়া—নৃত্যছন্দে প্রাণে তার লুটে
ভাষাতীত সৃজন-প্রবাহ। অপার গাম্ভীর্যে সে যে বহে
ব্যাকুল, চটুল নৃত্য মেঘনার শান্তস্রোত-সম।
জানি তারি মাঝে,
অনাদি নর্তনভঙ্গি গোপনে-গোপনে চলে। নাচে তারা নাচে, নাচে, নাচে!

আজি হেরি নাচে তৃণ, নাচে তৃণফুল ;
আপনার সৌগন্ধ-ব্যাকুল।
নাচে গুল্ম, নাচে তরু অপরূপ প্রাণ-স্রোত বহি।
জীবস্রোতপ্রপীড়িতা মাতা বসুন্ধরা, মহানন্দে আজি হেরি নৃত্যগান গাহে।
অঞ্চল দুলিছে রহি-রহি।
অদৃশ্যা কমলা নাচে, বিস্তারিতশ্যামল-অঞ্চলা।
নাচে সিন্ধু, ধরিত্রীর পদ-প্রান্তে বায়ুক্ষিপ্ত চ্যুতবাস-সম।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু, জীবন-প্রবাহ নাচে, নাচে সর্বভোলা।
ফুৎকার-উৎক্ষেপে তার নাচে অণু, নাচে অণুতম।

এ নৃত্যে অর্পিলো মূর্তি, কবি আজি ধ্যানলোকমাঝে।
গগন-ধরণী জুড়ি নৃত্যময়ী হেরি আজি নাচে।

কমনীয় তনু তার নৃত্যের হিল্লোলভরে মুহুর্মুহু উঠে বিকম্পিয়া।
কাঁপি উঠে লক্ষকোটি নর-নারী-হিয়া।
সৃজনের আদি হতে নব সৃষ্টিপ্রভাতের পারে,
সে বিশ্ব-নর্তকী নাচে জরা-মৃত্যু দলি পদভারে।
নূপুর-শিঞ্জনে তার বায়ুস্রোতে আসে ভাসি তালে-তালে সংগীত অপার।
মাতে অণু-পরমাণু বহি নিজ রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভাষাতীত মহানন্দ ভার।
লীলায়িত হস্তে তার সৃষ্টির কমল ফুটে ; নেত্রে হেরি মহিমা বিরাজে—
দৃষ্টির অতীত নৃত্যে প্রশান্তি ব্যাকুলি উঠে। বিশ্ব ঘেবি নাচে,
সে যে নাচে, নাচে, নাচে!

ধান্যমঞ্জরী

সুবর্ণ-সরোজাসীনা কমলার কম করপুটে,
সাগর-মন্থনদিনে ধীরে-ধীরে উঠেছিলো ফুটে
বিশ্বের ভরসারূপে, ভবিষ্যের মহাসঞ্জীবনী,—
জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রিয়া কন্যা হরিৎবরনী,
স্বর্ণশীর্ষা ধান্যের মঞ্জরী।
সুরাসুর ধীরে নিল বরি
আপন আলয়-মাঝে মহোল্লাসে পৃথ্বী-দুহিতারে।
সঁপিলো আবাস তারে বিদূরিয়া কাননে-কান্তারে।

বারিধির বক্ষতলে সুনবীনা ধরা—
কিশোর বয়স তার সুবিপুল আকাঙ্ক্ষায় ভরা।
আন্দোলিছে বক্ষ তার নব-নব সৃষ্টির হিল্লোলে।
মহাকলরোলে
সুমহান জীবস্রোত ধেয়ে আসে বাধাবন্ধহারা।
সংক্ষোভ বিরোধ বাজে। কাঁপি উঠে গ্রহচন্দ্রতারা।

সে মহাসৃজনক্ষণে অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডারের লাগি
ধীরে-ধীরে বিধাতার বর নিলো মাগি
ছিন্ন করি ক্লেশজাল প্রশমিয়া ক্ষুধাতমোরাশি
হেসেছিলো সুশোভন হাসি
বিস্তীর্ণ প্রান্তরতলে সূর্য-করে পবনহিল্লোলে,
ধান্যের মঞ্জরীদল মহাধাত্রী বসুন্ধরা-কোলে!

সে হাসি আজিও তারা বিস্তারিছে দক্ষিণ পবনে ;
তরঙ্গিত মহাশান্তি বিরাজিত ভুবন-প্রাঙ্গণে।
দ্বেষহিংসাকোলাহলে সভ্যতার আদিযুগ হতে
কমলার প্রিয়পাত্রী বিরাজিছে আজিও মরতে!
আজিও শরতে হেরি, তারি পাশে ফুটে কাশফুল।
ঘাট-মাঠ-পথ-বাট আজো তার সৌরভে আকুল!

চলিছে উৎসব।
আনন্দ ভবন-মাঝে নিশিদিন উঠে কলরব।
অন্ন দাও, অন্ন দাও ; জলে-স্থলে তাই দিকে-দিকে
চলিছে প্রচেষ্টা নানা। হেরি অনিমিখে
দুলিছে ধান্যের শীর্ষ বরাভয়া জননীর বেশে।
কৃষক গাহিছে গান। কণ্ঠ তার প্রান্তরের শেষে,
ধীরে-ধীরে বায়ুভরে অতিদূরে মেশে একেবারে!

হে লক্ষ্মী, সঁপেছ তুমি মৌন অশ্রুধারে
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ধান্যক্ষেত্রমাঝে।
তাই প্রাণে বাজে
বিশ্ব-সংগীতের রেশ সন্তোষেব সুবিচিত্র তালে।
মানবের ভালে
তাই ভাতে সুখরশ্মি ক্ষণিকের অতিথির মতো।
চক্ষে তার ভাসে জ্যোতি। বক্ষে আশা ধ্বনিছে সতত।

আজি দূর মাঠ-বাট ভরি
ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা হেরিতেছি দিবস-শর্বরী।
ভারতের নভতলে বহুদূর দৃষ্টি নাহি চলে ;
ঘনমেঘে বারি-পাতে আবরিছে শুধু পলে-পলে।
দিগন্ত তিমিরাবৃতা। সন্-সন্ বহিছে পবন।
দুলিছে অঞ্চল তব সুবিস্তীর্ণ হরিৎ-কেতন।

হেরি পরপারে,
নির্মল গগনতল। মেঘরাশি নাহি ভারে-ভারে।
ধরণী পঙ্কিল নহে। নাহি সেথা মত্ত বারিধারা।
তেজস্বী ধরণীশিশু চূর্ণ করি পাষাণের কারা
প্রবাহ আনিছে বহি রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের 'পরে।
জড়তা নাহিকো আর। হেরি থরে-থরে
বিরাজিছ তুমি দেবী, সুপ্রসন্না সন্তান-গৌরবে
বিজেতা তনয় তব ব্যাপে মহী সুগম্ভীর রবে।

হেরিনু চাহিয়া,
সুদূর প্রান্তর 'পরে স্নিগ্ধ করি তনুমন-হিয়া
দক্ষিণপবনসাথে ক্রীড়া করে মঞ্জরীর দল।
পল্লবে চলিছে লীলা। শুভ্রধেনু চরিছে কেবল।
যেন হেরি মহাশান্তি স্তরে-স্তরে করিছে বিরাজ।
স্তব্ধ, শান্ত বসুন্ধরা পরিয়াছে যেন শ্যাম সাজ!

ভাতিলো সম্মুখে সিন্ধু, অনন্ত উদার।
সংক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষ আন্দোলিয়া বিপুল, দুর্বার
সাগর মন্থন করে পোতারোহী সার্থবাহদল।
কমলার করপুটে ধান্যশীর্ষ নাহিকো কেবল।
আছে তাঁর পদ্মহস্তে শ্রমিকের রক্ত-রাঙা ধন।
ধরার বিশাল বক্ষ তারি লাগি করিছে খনন
ধনতৃষ্ণাভারাতুর।—রক্তশোষী নিশাচর-প্রায়
স্তম্ভিত, ব্যথিত সৃষ্টি, রসধারা নীরবে শুকায়।

স্বার্থ জাগে, জাগে দ্বেষ, ধীরে-ধীরে জাগে কোলাহল।
দক্ষিণ পবনে হেরি ক্রীড়া করে মঞ্জরীর দল!

কবি ভবভূতি

জাতূকর্ণীর অমর তনয়, সুদূর দিনের কবি,
ওগো ভবভূতি, বেদনা তোমার ফুটালো করুণ ছবি!
শ্যাম কান্তার-প্রান্তর-পারে ঘন নীল গিরিমায়া!—
তারি মাঝে কাঁদে মানব রাঘব। ঘনায় বিরহ-ছায়া!
অতি-মানুষের আনন এঁকেছ আতুর আঁখির জলে!
স্মৃতির সে ব্যথা-নিপীড়ন হেরি পঞ্চবটীর তলে!

নব শল্লকী-পল্লবদলে করি-করভক-সাথে,
কিশোরী বধূটি খেলিত তাহার কমল-কোরক-মাথে!
বনের চপল হরিণ-হরিণী লালিত সীতার করে।
সুখী শিখীদল-কলঝঙ্কারে তারি ভাষা মনে পড়ে।
হেরি সে দহনে কঠোর রাঘব সকলি গিয়াছে ভুলি!
অতি মানুষের বেদনা এঁকেছে মানুষ-কবির তুলি!

সুচির কোমল মানব-মরমে একটি রসের ধারা,
যুগ-যুগ ধরি বহি চলি যায়। দুই তীরে জাগে সাড়া।
কত গুঞ্জন, কত না ভাষণ ঘন আবর্তে চলে ;
সে রস, গভীর চিরসুকরুণ উপজে অশ্রুজলে!
এ বাণী তোমার করেছ প্রচার—ধন্য ধরার ধূলি।
অতিমানুষের বেদনা এঁকেছে মানুষ-কবির তুলি!

ললিত মধুর কবিতা তোমার, কভু গম্ভীর কায়া।
কভু নির্ঝর-ঝর-ঝর ভাষা, কভু বা বনের মায়া!
প্রেমিক-হৃদয়-জড়িত ব্যথারে ঘিরিয়া-ঘিরিয়া জাগে।
মরমে ধরিয়া শিশুর অমিয়া নব-নব অনুরাগে!
প্রিয়ার লাবণি মূর্তি ধরেছে ধ্যান-সুষমার মাঝে,
সংসার-পথে নব-নব সুরে প্রেমের বীণাটি বাজে।

সমাজে তোমার পাওনি আসন সুদূর দিনের কবি,
আজি মানুষের মরমে তোমার বেদনা ধরিছে ছবি,
নিরবধি কাল, পৃথ্বী বিপুল, সমানধর্মা আসে ;—
অটুট সাধনা-শতদল তব কালের সাগরে ভাসে!

বৈজয়ন্তী

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনে, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৫

বনান্ত-মর্মর-গীতি গাহি যায় চৈত্র-রাতি ;—উদাসিনী বিধুরা বধূটি!
যুগান্ত-স্বপ্নের ভাষা গুঞ্জরিয়া ফিরে যেন নির্বাকের আবরণ টুটি।
সে কহে, আমারি গান বৈশাখের উত্তরীয়-তলে,
বেলা-বন-মল্লিকার স্ফুট হাস্যে আপনি উথলে ;
প্রদোষের স্নিগ্ধতায়, কিশোর ঋষির কণ্ঠে, তমোহর নবতর বেশে,
উদাসিনী চৈত্ররাতি বেণুবন-পথে-পথে চলি যায় বরষের শেষে!

আজি বন-ভবনের নারিকেল-কুঞ্জে-কুঞ্জে নবীন প্রভাত-আলো জাগে।
সে যেন দূরের পান্থ,—আশীর্বাণী উচ্চারিছে সুকরুণ ভৈরবীর রাগে।
কহিল সে, আসি আমি বৈশাখ-সখার সাথে-সাথে,
নবারুণ-বিকশিত লীলাপদ্ম আনি দুটি হাতে।
চিক্কণ পল্লবছায়ে নত শ্যাম আম্রশাখে তাপসের বীণা তাই বাজে।
কিশোর বৈশাখ আসে নারিকেল-কুঞ্জে-কুঞ্জে আজি বনভবনের মাঝে।

তাই তার আবাহনী তরুণ কবির কণ্ঠে উদার উদাত্তসুরে ভাসে।
সুদূরের পান্থ-কবি বেদনা-তরণী বাহি গঙ্গানীরে, শ্যাম বঙ্গবাসে।
প্রতিভা সঁপিলো তারে আপনার জয়মাল্যখানি।
অচ্ছোদ-সরসী হতে সৃজন কমল দিলো আনি।
কহিল, তোমারে দিনু বিজয়ের রাজটীকা মরমী গো, হে কুশল কবি,
তোমার নবীনছন্দে নবতন স্বপ্ন জাগে। মূর্তি ধরে প্রভাতী ভৈরবী।

বঙ্গের অঙ্গনতলে সেদিনের সুধাস্মৃতি ধূপসম সৌরভ-আতুর।
পাষাণ-বন্ধন-মাঝে সন্ধানী নির্ঝর-ধারা সে দিন-ও যে ব্যাকুল, বিধুর
গুহাশায়ী প্রহরার সে দিন-ও যে প্রাণ কম্পমান।
সে দিন-ও যে শিলা হয়ে গতি চায় নিষেধ-পাষাণ।
চূর্ণ করি কারাজাল বাহিরিলো মহাস্রোত। তারি মাঝে হেরিনু তোমায়
বিস্ময়-বিমুগ্ধ প্রাণ মাল্যসম, গীতসম, ধূলিসম লুটাইতে চায়!

হেরিলাম তারো পরে দূরগামী ভাবস্রোত জটা হতে লভেছে জনম।
ভঙ্গে-ভঙ্গে মহারঙ্গে জটিল আবর্তে তাই নবোন্মেষ-উদ্বেল উদ্দাম।
প্রাণের স্পন্দনে তার বাণী আনে স্বর্গের বিভাস—
উদাস গম্ভীর সুর, কভু শুনি প্রেম-মন্দ ভাষ!
নিত্য তবু নৃত্য তার দক্ষিণের ইশারায়। প্রাণময় তাহারি আহ্বান।
জীবন-মালঞ্চ ঘেরি নিত্য জাগে জয়োল্লাস। পুষ্পময় মাধবী-বিতান!

কভু হেরি বটচ্ছায়ে ফসলক্ষেতের ধারে বৈরাগী সে ঝাঁঝরি বাজায়।
ব্যাকুল বাউল কভু নৃত্য করে ভাবাবেশে, একতারে গুঞ্জরিয়া যায়।
সারাটি গগন ঘেরি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে স্পন্দে সেই সুর।
রক্তিম পল্লব যেন বায়ু-স্রোতে কম্পন-বিধুর।
সারাটি অন্তরে মোর সে সংগীত বাজি যায় দিবসের প্রহরে-প্রহরে।
নবীন ঋতুর পর্ণে বর্ণে-বর্ণে বিভা তার অলক্ষের ইঙ্গিতে মুঞ্জরে!

এ কী সৃষ্টি মধুময়ী! এ কী গান উঠে বাজি সুধাক্ষর মোহন বীণায়!
জীবনের অঙ্কে-অঙ্কে মর্মের অঙ্কুরগুলি রসধারে সঞ্জীবিতে চায়।
আরণ্য আনন্দ-ভাষা ঋষি যেন করে উচ্চারণ ;
সপ্তপর্ণছায়াতলে স্বপ্ন লভে রবির কিরণ।
তারপরে গুঞ্জরণ, কত মঞ্জু মুঞ্জরণ ; প্রভাতের স্বর্ণ-সিংহাসন,—
আলোক-উজ্জ্বল ; দিবা ইঙ্গিত-সংগীতময়। প্রাণ-ময় বিচিত্র ভাষণ!

শতাব্দীর ব্যথাভার তোমার সৃষ্টিতে কবি, নিরন্তর উঠিছে উচ্ছলি,—
শত বর্ষ-পরে কার ধ্যানস্তব্ধ চিত্তে তার বেদনা-বিভাটি উঠে ঝলি।

সে কি গো বসিবে আসি বসন্ত-বেলার অবসানে,
পরিণাম-রমণীয় দিনান্তের স্নিগ্ধ-গন্ধস্নানে,
অগুরু-ধূপের বাসে আকুলিবে কেশভার দক্ষিণের বাতায়ন-তলে!
লাজনতনেত্রে সে কি পড়িবে কবিতা তব ব্যথাসুখে ভাসি অশ্রুজলে!

জানি সে করিবে পাঠ আনন্দ-উদ্বেল মনে। তাই উঠে প্রাণভরা গান।
জানি সে বাসিবে ভালো তোমারি সাধের স্বপ্ন। তাই জাগে আকুল আহ্বান!
সে দিন-ও এ আম্রবন অজানিত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে,
আতাম্র মুকুলদলে ভরি দিবে সুরভি নিঃশ্বাসে!
সে দিন-ও কিশোর বন্ধু শালবীথিকার তলে অন্যমনে রহিবে উদাসী।
বিরাট পাষাণ-পুরে বধূর অন্তর জুড়ি বাজিবে সে পল্লী-বল্লী-বাঁশি।

আষাঢ়ের মায়া রচি অন্তর-গগনে মোর এলে তুমি, তাই শুধু জানি।
সে দিন বর্ষণ-সুখে পুলকিতা ধরণী সে নীপবনে ফুটায়েছে বাণী!
সে দিন আনিয়া দিলে উজ্জয়িনী-স্মৃতির সৌরভ।
কেয়া-গন্ধে মিশে যায় ভবন-শিখীর কেকারব।
তারি সাথে এলে তুমি। তাই শুধু জানি আর ভাবমুগ্ধ রহিনু নীরবে।
কত-না শ্রাবণ-সন্ধ্যা হৃদয়ে ঘনায়ে এল তন্দ্রাতুর গুরু-মেঘরবে।

শ্যাম-শ্রীর সমারোহে একদা প্রভাতে উঠি হেরিলাম সবিস্ময়ে চাহি।
কখন আসনে মোর এসেছ নীরব হাস্যে বিস্ময়ের সীমা নাহি-নাহি।
ধরণীর প্রতি তৃণে আনন্দ-শিহর উঠে জাগি।
প্রতিটি পল্লব মোর করের পরশ ফিরে মাগি।
প্রাণের প্রবাহ-সাথে সেইক্ষণে পরিচয়। তারপরে অনুদিন ধরি
তূর্ণগতি মুক্তধারা মিশে যায় প্রতিঘাতে পথে-পথে জড়তা পাসরি।

আমার এ মাল্যখানি তুলি দিনু তব করে, আজিকার বৈশাখী প্রভাতে।
আমার মর্মের কথা তুমি শুনি লও কবি অশথের মর্মরের সাথে।
চম্পার কোরক জাগে বনতলে গন্ধ-সুষমায়,—
তারি স্বপ্ন হেরি বসি পল্লিছায়ে লীলায় হেলায়।
তমালবনের পারে নীরবে ঘনায় ছায়া। তারি মায়া আনে মোহঘোর।
সে ছন্দ-আনন্দ-গান প্রণতির সাথে লহ। তারি সাথে লহ চিত্ত মোর!

রৌদ্র

ছায়া আসে ঘনতর হয়ে ; জাগো-জাগো হে রুদ্র-সন্তান,
দীপ্ত তব প্রহরণ আনি দৃঢ় পদে হও আগুয়ান!
তীব্র তব বেগময়ী বাণী দিকে-দিকে দাও প্রসারিয়া।
ওষধির পত্রময়শাখে তরুশিরে পড়ুক আসিয়া।
বনচ্ছায়া ম্লানতর হলে সুসরল রশ্মিরেখাপাতে,
করো দূর তমোময়ী গ্লানি পরিপূর্ণ শান্তির প্রভাতে!

সূর্যসখ, ধীরে এসো নামি ধরণীর সভাগৃহতলে!
স্বর্ণচূড় মেরুশির 'পরে উষ্ণভাস, প্রদীপ্ত অনলে
পূত হবি-আহুতির লাগি কল্যাণের ধ্রুব হাসি হেসে
উত্তরিয়া এসো বীর আজি দীপ্ত দেব-সেনাপতি-বেশে!
উদয়ের তীর্থপদ হতে উষসীর মলিন আলোকে,
হে প্রমত্ত, সঞ্চরিয়া এসো রশ্মি ব্যাপি দ্যুলোকে-ভূলোকে!

শূন্যপথে হও অগ্রসর জ্যোতির্ময় কনক-কিরীটি,
মেঘলোকে উঠ ঝলসিয়া দগ্ধ করি সর্বলোক-দিঠি।
তারপরে এসো ধীরে নামি ধরিত্রীর মায়ালোক 'পরে।
তরুকুঞ্জে কন্দরের ছায়ে অন্ধকার যেথা থরে-থরে,
সেথা এসো মৃদু হাসি হেসে পরিস্ফুট শুভ্রকুন্দোপম
করস্পর্শে দূর করি দাও অবিচ্ছিন্ন বিমলিন তম।

জরা হতে ধরারে উদ্ধারি প্রদানিলে নবীন যৌবন ;
শ্যামলতা সঁপি দিলে তারে ; দূরে গেল অনন্ত ক্রন্দন।
তরু ঊর্ধ্বে মেলে তার শাখা ; ফুটে উঠে কোরক গোপন।
প্রাণে জাগে করম-প্রেরণা, রূপ ভাসে নয়ন-শোভন।
সৃজনের ইন্দ্রজালভার বহ তুমি হাসিতে-হাসিতে,
মরুভূর বক্ষ 'পরেরহ অগ্নিবাণ হানিতে, নাশিতে।

তব ক্রোধে কাঁপি উঠে ধরা, হে প্রখর, প্রদীপ্ত, ভীষণ,
মহানলে দগ্ধ হয় ভূমি ; কর দর্পে সাগর শোষণ।
ঘূর্ণিবায়ু জাগি উঠে বেগে প্রলয়ের মত্ত অট্টোল্লাসে
হাহাকারে পূর্ণ করো দিশা, ভরে প্রাণ গভীর হুতাশে।
একাধারে বিরাজিছ তুমি সুকোমল, কুলিশ-কঠোর,
বিধাতার বজ্রহস্ত তুমি, তুমি পুন সৃষ্টিলীলাডোর।

ছেয়ে যায় দিশে-দিশে যবে বন্ধহারা নীরন্ধ্র আঁধার,
হিমশীত নিঃস্ব পৃথ্বী ঘিরে জাগি উঠে মত্ত হাহাকার,
বেদনার সদ্রুত নিঃশ্বাসে, অবিরাম মৃত্যুর লীলায়,
মহোদ্বেগে কাল যাপে ধরা প্রলয়ের তামসী নিশায়,
নিখিলের প্রার্থনার মাঝে সুবিপুল প্রাণ-স্পন্দমান,
ঘনতর বেদনার ছায়ে জাগো-জাগো হে রুদ্র-সন্তান!

উল্কা

নিশার বিশাল বক্ষ নিঃশব্দে ছিঁড়িয়া,
আকাশের প্রান্ত বিদারিয়া,
প্রিয় মোর, বন্ধু মোর, তুমি এসো এই বক্ষ 'পরে।
হেথা থরে-থরে,
সাজানো রয়েছে তব শত আয়োজন।
তোমার বিদ্যুৎস্পর্শে চিরদিন পরম শোভন!

তোমা-লাগি প্রিয়,
জ্বালায়ে রেখেছি বক্ষে স্বীয়
তীব্রতম যন্ত্রণার কালানল-শিখা!
দুঃখের এ রক্তটিকা
পরেছি ললাট-দেশে তোমার আসার পথ চাহি।
আজি নাহি-নাহি
সামান্য সন্দেহ-দ্বিধা অণুমাত্র জড়তার ভার।
মৃত্যুর গর্জনে রোলে তব সাথে মিতালি আমার!

এ দেহ লুটায়ে যাক আঘাতে তোমার,—
এই বাণী, এই স্পর্শ, এই হাসি, এই চিন্তাভার
ধুলায় লুটায়ে যাক চক্ষের নিমেষে;
তারপরে সুনির্মল বেশে
জ্যোতির মুকুট পরি তোমা-সাথে হবে আলাপন।
হৃদয়ে-হৃদয়ে হবে অহর্নিশ মুগ্ধ দরশন!

মহাক্ষুধা

মহাক্ষুধা জাগে আজি প্রাণে,
জাগে দেহে, জাগে সবখানে।
এ রুদ্ধ দুয়ারে সে যে ঘন-ঘন করে করাঘাত!
হেরি অকস্মাৎ,
ব্যক্তিরে সে আবরিয়া দেশে-দেশে সমাজে-সমাজে,
আপনার মহিমায় একছত্র রহে রাজ-সাজে।

নব-নব প্রেরণার বলে,
মানুষ সৃজিছে যারে মাটির এ ধরণীর তলে,
আপনার রক্ত দিয়া, আপনার আশা ভাষা সঁপি,
কল্পনায় যার নাম জপি
মানুষ আনিছে ডেকে আপনার দেহের দুয়ারে,
অলক্ষিতে চিরদিন জানি সে যে চাহিয়াছে তারে!
এই তার ক্ষুধা,—
এই তার চিরন্তনী সুধা
জানি তারে করিছে আহ্বান!
দেশ হতে দেশান্তরে, মেরুশিরে এরি জয়গান!

কেহ তারে বলে আশা।
কেহ তারে কহে ভালোবাসা।
কেহ কহে জ্ঞান, প্রেম. কেহ কহে ধ্বংস সর্বনাশা।
কেহ বা কল্যাণমূর্তি হেরিতেছে সম্মুখে তাহার।
সে যে সত্য নগ্নরূপ এ বিশ্বের অনন্ত ক্ষুধার!
জানি, তারে জানি ;
আমারে সে দিলো প্রাণ। আমারে সে রূপ দিলো আনি।
প্রথম আলোক-লিপিখানি
সে মোর ললাটে দিলো সৃজনের শুভক্ষণে টানি।
তারপরে প্রতিদিন নব-নব রূপে
তার সাথে হল পরিচয়।
আপন কামনা-ধূপে
তাহারে সুরভি তুলি মানি মনে অপার বিস্ময়।
ক্ষণে-ক্ষণে দিনে-দিনে ক্ষুধা তার বাণী মোরে কয়।

সভ্যতার সর্বঋদ্ধিমূলে,

এই ক্ষুধা মহাদান দিলো তার তুলে।
মৈত্রেয়ীর মহাবাণী দিলো তাঁর অতৃপ্তির মাঝে।
দিলো বিশ্ব-সাধনার নব-নব সাজে।
এল কভু শুভ্রবেশ পরি
সুকঠোর তপস্যায় আপনারে সর্বরিক্ত করি!
তারপরে বসন্তের দিনে
উমার মিলনে এল আপনার পথ চিনে-চিনে।
তবু সে রহিলো বসি জাগি!
যুগে-যুগে প্রাণে-প্রাণে তৃপ্তিহীন মহা-আশা মাগি।

দিন চলি যায়,
এই ক্ষুধা নাহি রহে অনায়াস অলস শয্যায়।
গতি তার বাড়ি চলে নানা রূপে, নানা সভ্যতায়।
জাতিতে-জাতিতে তার সুমহান্ ডঙ্কা বাজি যায়।
উঠে ধীরে অনন্ত আহ্বান ;
দেশ হতে দেশান্তরে মেরুশিরে এরি জয়গান।

শেলি

কুয়াশায় ঢেকেছে আকাশ।
শীতের সুতীব্র রাত্রি ; বহে তায় উত্তর-বাতাস!
পাণ্ডুর চাঁদের আলো স্বপ্নলোক এনেছে ধরায় ;
দূরে শুনি নীড়হারা পাখি ডেকে যায়!
মরণের ছায়া যেন নয়নে ঘনায় ;—
বিষাদের অভিসার। থেমে গেল হায়,
জ্যোতির উৎসব মোর হরষের বাণী!
অন্তর-আকাশ মাঝে বেদনার তীব্র রেখা টানি
অপূর্ব আশার পাখা মেলি
আমার আঁখির আগে এলে তুমি—হেরিলাম শেলি!

তোমার মুরতি আমি হেরিলাম কবি,
তোমার এ ধরণীর ছবি
কোথায় লুকায়ে গেল আকাশের কুয়াশার গায়।
তারি মাঝে হেরি দেখা যায়

অপূর্ব পাণ্ডুর মূর্তি, শীর্ণ দেহ, ব্যথা-ম্লান আঁখি
সুদূরের পানে চাহি নিরাশায় নমে থাকি-থাকি!
যেন কোন্ নাম-হারা নক্ষত্রের মাঝে
দৃষ্টি তার রত্ন লভিয়াছে!
যেন দূর ছায়া-পথ-পারে,
পেয়েছে সে, চেয়েছে যাহারে!

সারাদিন গাহি যার গান,
সন্ধ্যায় সিন্ধুর নীরে পেলে যার পরম সন্ধান,
সেই প্রিয় মরণের সুশীতল স্নেহময় ছায়ে
আপনারে দিয়েছ বিলায়ে!
বিষণ্ণ মরণ তাই বিষাদের নব ব্যথাভারে,
পথে তার চলিতে যে নারে!
তাই তার দীর্ঘশ্বাসে নভে হেরি কুয়াশা ঘনায়।
তোমার বিশীর্ণ চাঁদ ভয়ে-ভয়ে মাঝে-মাঝে চায়।
তব প্রিয়তমা নিশি আজি তাই ক্লান্তিভার বহি
চাহে তব মুখপানে হে চিরবিরহী!

চির অমৃতের আশা, সুদূরের পানে চেয়ে-থাকা ;—
অপূর্ণ আশার ভারে প্রাণমন ঢাকা ;—
সারাটি জীবন ভরি গ্লানিময় ব্যর্থতায় বহি
প্রেমের বেদনাটিরে সহি
রচিয়া কাব্যের মাঝে চির-নব ইন্দ্রজাল-মায়া,
অপূর্ব স্বপন-সাথে মিশাইয়া আপনার কায়া
সমাজের শাসনেরে ঘৃণা-ভরে দূরে দিয়া ঠেলি
এ কি খেলা খেলিয়াছ শেলি! .

পুরব-সাগরপ্রান্তে শতক্রোশ ব্যবধান ছাড়ি
জীবন-সাধনা তব আজি দেয় পাড়ি!
উদ্দাম তোমার সুর ছেয়ে গেছে নবীন ভারতে।
প্রতি হিয়া-মাঝে তার পরতে-পরতে
হয়ে গেছে সনাতন স্থান,
জগৎ গাহিছে কবি, আজি তব প্রিয় রুদ্র-গান।

হে চিরসুন্দর

হে চিরসুন্দর,
মানুষ চাহিছে তোমা যুগ-যুগান্তর
আপনার জীবনের মাঝে।
সকল চেষ্টায় তার তুচ্ছতম কাজে,
তোমার ক্ষণিক স্পর্শ সে যে পেতে চায়—
না-পাওয়ার বেদনায় দিন তার ধীরে চলে যায়!

কুৎসিতের মহামেলা চলিয়াছে রাত্রি-দিন ধরি!
হে সুন্দর, কবে তুমি আপনা পাসরি
কাহারে পরশি যাও, সে তো নাহি জানে।
সহসা ব্যাকুল বাণী জাগে তার প্রাণে ;
ভাষা তার গুমরিয়া মরে।
না-বলার বেদনায় অশ্রু তার ধীরে পড়ে ঝরে।

হে পরশমণি,
তোমারে যে ভালোবাসে, তারে তুমি এখনো চেননি ;
তুমি যারে চাও,
তারে তুমি সব দিয়ে যাও!
চাহ না যে ফিরে,
ব্যর্থতা কোথায় কার বক্ষ বসি চিরে।

অধরা, তোমার পিছে ভিখারি যে চলে নিশিদিন।
ছিন্ন তার হৃদয়ের বীণ।
সূর্য-চন্দ্র-গ্রহতারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণ ;
আলো যে ফুরায়—
এ চলাব শেষ নাহি হায়!

হে চিরসুন্দর,
রুদ্র জানি তব সাথি, ব্যথা জানি তব অনুচর ;
ক্লেশের কণ্টকপথ 'পরে
যাত্রীর চরণ-রক্ত পড়ে যায় ঝরে।
জাতির কল্যাণপথে ধ্বংসে তুমি পাঠাও নীরবে।
তারপর যবে,
ক্ষতির পাটল-পুষ্প ভক্ত তোমা দেয় উপহার,
নির্দয় তখনো তুমি অন্তরালে প্রসারি আঁধার,
দুই পায়ে দলি তারে যাও।

ফিরে নাহি চাও,
যারে তুমি ভালোবাস, তারে তব সকলি বিলাও!

শরৎ-প্রশস্তি

শরতের জন্ম হেরি শ্রাবণের মরণ-শয্যায়
প্লাবন-পীড়ন-ক্ষণে। প্রভাতের সন্ধ্যার লীলায়
ধরিত্রীর নব অভিসারে।
আজি তারে
হেরি মুগ্ধ চোখে।
জলস্থল আবরিয়া নগ্ন শিশু প্লাবিত আলোকে,
কাশকুসুমের সমারোহে। হাসির আনন্দগান
দিগ্বিজয়ী বীরশিশু তীব্রবেগে করিছে সন্ধান
পূর্ণা তটিনীর পাশে-পাশে। নর্তনের তালে-তালে
সৃষ্টির বিষাদভাতি মুহুর্মুহু জাগে তার ভালে
বিজয়ার অশ্রুর বাসরে।

তারি মতো মানব-অন্তরে
আজিকে ফেলিছ ছায়া,—নবমায়া হে চির-নবীন,
বেদনা-পীড়ন-ক্ষণে। চিত্তউৎস-উৎসারিতরসে
সাজাইছ ভারতীরে আনন্দ-রভসে
বিচিত্র মাল্যের ভারে।
হেরি অনুদিন
যে গান গাহেনি কেহ, তারে তুমি সঞ্চারিছ প্রাণ।
ধুলায় মলিন বীণা কোলে টানি করিছ সন্ধান
মূর্ছিত সুরের বাণী। যারে কেহ কহে নাই কথা,
তাহারে আনিছ বুকে পূর্ণ করি সকল ব্যর্থতা!

শরতের দীপ্ত রৌদ্র, পাশে তার ছায়া গাঢ়তম।
ক্ষতির কণ্টক দলি বিক্ষেপিয়া জীবনেব তম
প্রসারিলে দৃষ্টি তব স্তব্ধ ঘন অন্ধকার-তলে
গ্লানির জীবনে যেথা অন্তরের দীপ্ত মণি জ্বলে
অধীর, ব্যাকুল লগ্নে। তারে হেরি এনেছ বাহিরে
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে—পুরাতন প্রাসাদ-কুটিরে
দিবার আলোক-তলে। ধূলি-ম্লান জীবনের বাণী
রেখেছ কৌস্তুভসম সযতনে বক্ষতলে আনি!

আজিকে স্রষ্টারে তব নব সৃষ্টি-অর্ঘ্য-উপহারে
নীরবে পূজিছ কবি। জীবনের জয়টিকা বহি
শরৎ নমিছে যথা মেদিনীর চরণের তলে,
পূর্ণতাব বাণীটিরে রাখি দিয়া মৃত্তিকা-অঞ্চলে
নবীন সৃজন-বেগে। অসঙ্কোচে সত্যবাণী কহি
তোমার সৃষ্টির গান রাখি দিলে রচনা-সম্ভারে।
কালের গভীর রন্ধ্র পূর্ণ করি অমর ভাষায়!
বেদনারে বাণী দাও নবোন্মেষ-দীপ্ত-প্রতিভায়।

উত্তরবায়ু

খোল দ্বার, খোল দ্বার,—খুলে দাও দ্বার ;
ম্লান হল শরতের শ্যাম উপচার ;—
বায়সের তিক্ত কণ্ঠ, কুয়াশার সুধীর সঞ্চার,
হেরি মাঝে তার
শেষ গান, রিক্ত প্রাণ, ছিন্ন কণ্ঠহার!
ঝরা পাতা ম্লান ফুলফল,
শুষ্ক ধূলি জমিছে কেবল।
জীর্ণ তনু, কাঁপে বুঝি স্নায়ু ;—
খোল দ্বার, খোল দ্বার—আসিয়াছে উত্তরের বায়ু!

কাঁপে শিরা-উপশিরা ; কাঁপে আজি নিখিলের প্রাণ।
কোমলতা হয় অবসান ;
শুষ্ক দেহ, শুষ্ক মুখখানি—
নাহি সরে বাণী।
কোথা শোভা শ্যামলতা? স্নেহ-প্রেম নাশি
হাসি অট্টহাসি,
শেষ করি নিখিলের আয়ু,
এল তীব্র উত্তরের বায়ু!

তুমি এলে হে নিঠুর, কার ব্যথা বহি—
কার লোহু পিয়া রহি-রহি
কার অশ্রুজলমাখা চক্ষুদুটি অন্ধ করি দিয়া?
কাঁপাইয়া ধরণীর হিয়া,
হিমানির বুকে সঞ্চরিয়া,
তীব্রতারে লভি
হতাশায় ভরি প্রাণ, ম্লান করি আকাশের রবি,
বহি কার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
এলে তুমি উত্তর-বাতাস?

তোমারে চাহে না ধরা হে বিজয়ী, হে নিঠুররাজ!
তবু হেরি নাহি তব লাজ?
বিরাগের রসহীন, শুষ্ক আভরণে
কেন তারে সাজাও যতনে?
তীব্র তুমি, দৃপ্ত তুমি ;—তোমার পরশ
নিলো তার সকল হরষ।
নিলো তার আশা, নিলো গান।
জরাভরা বৃদ্ধা ধরা—দীপ্তি অবসান!

তুমি মহাকাল-সখা—শুভ্র তব উত্তরীয়খানি
শীতের রথাগ্রে চলে ; টুটে যায় গ্লানি।
টুটে মোহ, টুটে চিন্তাভার,
খুলে যায় দ্বার—
মুছে যায় মিথ্যা আশা, রাশি-রাশি কল্পনার ভার!

বহ-বহ উত্তর-বাতাস,
আনো আজি বিরহীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
সুতীব্র চেতনা দাও, জড়ে দাও শীতের কাঁপন—
খুলে দাও ঘুমের বাঁধন!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

কল্লোল

তিমির-রাত্রির বক্ষে সাড়া দিয়া সচকিয়া দিক,
কারা সব নির্মম পথিক
যাত্রার আনন্দ-গানে ধরণীরে দিয়ে গেল দোল!
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

জমিছে বন্ধনরাশি ; অন্ধকারে বারে-বারে তাই
মোরা সবে পথ ভুলে যাই!
নিশার আকাশ চিরে বিদ্যুতের কটাক্ষ বিলোল ;—
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

প্রশ্ন বাড়ে দিনে-দিনে, কেহ নাই নাহি পাই সাড়া—
ভীতি জাগে, প্রাণ দিশাহারা!
এ নিবিড় যবনিকা তোল্‌ আজি তোল্‌ তোরা তোল্‌-
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

কুসুম ফুটেছে আজ, হেরি ওই—মধু কই হায়,—
পিপাসায় আকণ্ঠ শুকায়!
কোথা তোরা? আয় সবে—নির্ঝারিণী, তোলো বন্যারোল!
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!
ব্যথায় দহিছে প্রাণ ; কোথা শান্তি? ভ্রান্তিরাশি আজ
পদে-পদে করিছে বিরাজ!
আলোক-তরণী আসে ;—রাত্রি যায়, ব্যথা সবে ভোল্—
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

পৌষ, ১৩৩১

আবির্ভাব

তোমারে ডাকিয়াছিনু জীবনের পথে বার-বার ;
তাই এলে সম্মুখে আমার!
সন্ধ্যার ছায়ার মতো ধীরে-ধীরে সুমন্দ সঞ্চারে,
এলে তুমি, দেখিলাম জীবনের পথের আঁধারে!
ফুলফোটা হল শেষ, থেমে গেল গান,
উজল দিবস মোর হল অবসান!
পাখি ডাকিল না আর, নিবে গেল আলো,
তোমার বিপুল ছায়ে কায়া মোর মিলালো, মিলালো!
দুটি বাহু প্রসারিয়া এলে তুমি অতিথি ভীষণ—
আমারে লইলে কোলে, করেছিনু তব আবাহন।

এমনি করিয়া—
তোমারে যে ডাকে প্রিয়, পলে-পলে মরিয়া-মরিয়া—
তীব্র আলিঙ্গনে তব তাহারে কি লও তুমি ঘিরে?
তোমার ভীষণ স্নেহে সে যে সখা, ভাসে আঁখি-নীরে!
কি কঠোর পরশ তোমার!
সুধাপাত্র করি শেষ তুমি এলে সম্মুখে আমার।
তুমি ছিলে কল্পনার মাঝে
ছিলে আলস্যের দিনে ঘুমভরা স্বপনের সাজে!
আজি হেরি আকার তোমার—
চিত্তে মোর উঠে হাহাকার!
স্বপন গিয়াছে টুটি সমুজ্জ্বল এই রৌদ্রালোকে,
তোমার মুরতিখানি ঝলকিছে পলকে-পলকে:

আজি তব লেলিহান রোষানলশিখা—
আমার ললাটে সখা, লিখে দিলো দগ্ধ রক্তটিকা।

মহারাজ, আসিয়াছ জীবনের ভস্মসৌধচূড়ে,
তোমার কেতনখানি তাই বুঝি উড়ে!
মূঢ়তার হল শেষ, অন্ধকার গেল বুঝি ঘুচে!
যা কিছু মিথ্যার লেখা দিলে সব মুছে!
এই ধ্বংসস্তূপশিরে জ্বেলে দিলে একটি প্রদীপ—
অসুন্দর ললাটের একখানি টিপ!
খুলে দিলে সর্ব আভরণ,
রিক্ত, চিরমুক্ত আজি পতিত জীবন!
ভুলো তোমা ডেকেছিনু জীবনের পথে বার-বার।
ভুল হল মহাসত্য,—এলে তুমি সম্মুখে আমার!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

মাধবী

হে শ্যামা মাধবী,
আনন্দ-চঞ্চল তব রাগরক্ত ছবি
স্মৃতির আঁধারস্তূপ ভেদি
প্রদীপ্ত অরুণসম প্রত্যূষের কুজ্ঝটিকা ছেদি
চিত্তে মোর দিল দেখা—
নিশার আকাশে যেন শশাঙ্কের ক্ষীণ জ্যোতিরেখা!

হে স্নিগ্ধা বল্লরী,
ওই রূপখানি তব চিত্তে মোর ধরি
ভুলিলাম বহু শোক, নিরাশার বেদনার বাণী,
তোমার পল্লবপুঞ্জ চিত্তে মোর শ্যামরেখা টানি
স্তবকে-স্তবকে ভারে-ভারে
প্রস্ফুটিত কুসুম-সম্ভারে,
শোভিল সুষমাটিরে বহি।
আজি রহি-রহি
সেই কথা জাগে মোর প্রাণে,
কবে বসন্তের দিনে ফাল্গুনের দিবা-অবসানে,
সন্ধ্যার নীরব নম্র শব্দহীন সুধীর সঞ্চারে,
জীবন-লাবণ্যভরা চিরশ্যাম হেরেছি তোমারে!

মাধবী,
আজি তোমা ডাকে কবি,
চিরমরণের দেশে, নিরাশার পথের দু-ধারে,
যেথা একেবারে
অমৃত পায়নি ঠাঁই, সৌন্দর্যের ভিখারির বেশ,
যেথা নাই মাধুরীর লেশ,
সেথা তুমি পরি এসো শ্যামল সুঘন আবরণ,
পরিপূর্ণ প্রাণরসে মৃতে দাও অনন্ত জীবন।

আমার চলার পথে তব সাথে দেখা বহুবার,
ভুলিতে পারি না কভু আর—
সেই ক্ষণে,
আমার এ মনে,
স্মৃতির হিন্দোলখানি দুলেছিল অপূর্ব উল্লাসে,
তাহারি আনন্দকণা আজি মোর চিত্তে ভেসে আসে,
ভেসে আসে ধীরে অতি ধীরে,
বসন্তের উন্মদ সমীরে,
পরিপূর্ণ কান্তি তোর বর্ধমান, চির অভিরাম
ভাদ্রের পূর্ণতাদৃশ্য তোরি রূপে জেগেছে সুঠাম!

অয়ি শ্যামা আনন্দলতিকা,
তোমার যৌবন যেন ভাবময়ী অপূর্ব গীতিকা,
প্রকৃতির কাব্যে হল লেখা—
মোর বক্ষনভ-তলে তুমি যেন স্নিগ্ধমেঘরেখা!
তুমি যেন স্নিগ্ধা বঙ্গবালা।
বসিয়া নিরালা!
যে কল্যাণী নিজ মনে,
স্তব্ধ গৃহকোণে,
সুখময় স্বর্গলোক করেছে সৃজন
তুমি যেন তারি প্রিয়জন!
তাহার লাবণ্য আজি হেরিতেছি পল্লবে তোমার।
তার মৃদু হাসিখানি পুষ্পে তব রাজে অনিবার।
তার স্নেহ, তার আশা,
তার যত প্রেম-ভালোবাসা,
তার অশ্রু, তার ব্যথা সবই যেন দিয়াছে তোমায়,
মাধবী, সার্থক তুমি স্বর্গলোক এনেছ ধরায়!
তোমার পল্লবছায়ে,
মৃদুমন্দ বায়ে,

বিশ্রাম লভিতে চায় হিয়া—
দিও তার বেদনা নাশিয়া!
পুষ্পনম্র শাখাগুলি দুলায়ে-দুলায়ে
ছায়াখানি দিও গো বিলায়ে!
চিরমরণের দেশে চিরশ্যামা মাধবীলতিকা,
গাও আজি দুলি-দুলি অমৃতের আনন্দ-গীতিকা!

বৈশাখ, ১৩৩২

শেফালির মৃত্যু

শরতে যাহারা ঝরিয়া পড়িত গোপনে,
ধীরে ধরাতল-শয়নে,
উষার পরশে জনমবৃন্ত তেয়াগি
শুভ্র হাস্য হাসিত তাহারা কি লাগি?
ইশারায় তারা সাড়া দিত বুঝি সদলে,
জীবন তাদের জাগিত মরণ-বদলে।
আজি কুয়াসায় কোথা তারা হায় লুকালো?
শীতল শিশির-পরশে কি তারা শুকালো?
বিফলে বালিকা খুঁজিছে পুষ্পবীথিকা--
ব্যর্থ শেফালি-চয়নে।
শীতের আভাসে মরেছে শেফালি, বিধুরা—
নাহি ধরাতল-শয়নে!

শয়ন তাহারা পেতেছে নিশীথ-গগনে!
কি জানি কি শুভলগনে,
আকাশে আজিকে চাহ-চাহ ওগো বালিকা।
নিবিড় আঁধারে ফুটেছে শেফালি-কলিকা!
রজনীর শেষে তাহারা পড়িবে ঝরিয়া—
অস্ত-অচল-শয়নে রহিবে মরিয়া!
শুভ্র আঁচল দুলায়ে প্রভাত-কিশোরী
তাদের কুড়ায়ে গাঁথিবে বাঁধিয়া কবরী ;
ফুটিবে, ঝরিবে তাহারা নিশীথ-গগনে,
গন্ধ ভাসিবে পবনে,
শীতের আভাসে মরেছে শেফালি—বিধুরা
নাহি ধরাতল-শয়নে!

কার্তিক, ১৩৩২

নবীন মন্ত্র

নূতন করিয়া গড়িতে হইবে জানি—
আমাদের এই পুরানো জীবনখানি।
গ্রন্থিল বাস ধুলায় মলিন হল ;
তালিতে-ফাঁকিতে কতদিন রবে বলো!
ফাঁকে-ফাঁকে তার ব্যাধি যে বাঁধিছে বাসা-
মুদিত নয়ন ; মুখে নাহি সরে বাণী ;
পরম প্রবীণ পুরানো জীবনখানি!

মেঘে-মেঘে হায় হয়ে গেল বহু বেলা!
জীবন লইয়া এখনো চলিছে খেলা!
যন্ত্রের মতো মন্ত্রবচনগুলি
চলিছে কেবল উড়ায়ে শুষ্ক ধূলি!
বঙ্কিম পথ পঙ্কিল হল যবে,
তখনো কি সেথা নীরবে চলিতে হবে?

নবীন, তোমরা বসিয়া রহিবে কত—
জীবনবিহীন জড়-পুত্তলি-মতো?
যাত্রাপথের তোমরা হইবে সাথী ;
তোমরা আনিবে আশার মধুর ভাতি!
বেদের নূতন সূক্ত-সৃজন করি—
তোমরা তাহারে পরানে লইবে টানি।

প্রাণের শান্তি ভক্তির সাথে নিলে।
তোমরা জাতির আশার আভাস দিলে।
ফাঁকিরে তাড়ায়ে ভ্রান্তির সাথে-সাথে,
যুগে-যুগে গুরু-গঞ্জনা নিলে মাথে!
গায়ত্রী আজি নূতন করিয়া গাহো—
শুনাও আশার নবীন অভয়-বাণী ;
নবযুগ আজি রহিল চাহিয়া পথে—
গড়িবে তাহার নবীন জীবনখানি।

আশ্বিন, ১৩৩৩

মহত্তর ভারত

অধিকার-সীমা লঙ্ঘি যাঁরা চিরদিন,
আত্মার আনন্দস্রোতে মুক্তিগান গাহি
গেছেন দুর্দম বেগে, দিনরাত্রি নাহি
তপস্যার আয়োজনে—বিশ্রামবিহীন!
তাঁদের অনন্তকীর্তি কাল, সীমাহীন
জাতিরে দিয়েছে সঁপি। অমরতা চাহি
চলেছে যাত্রীর দল দুঃখে অবগাহি—
দিন যায়,—আশা তবু নাহি হল ক্ষীণ!
জাতির শাশ্বতবাণী যাঁরা দেশে-দেশে
গণ্ডির নিষেধ ভুলি গেলেন প্রচারি,
স্বদেশের কেতনেরে অমানিশাশেষে
নীরবে বহেন যাঁরা দূরে দিয়া পাড়ি,
কেহ কি ভুলিবে কভু ম্লান হাসি হেসে,—
তাঁদের অক্ষয় বাণী ভ্রান্তি লবে কাড়ি?

আরণ্যক তপস্বীর অন্তর-আলোকে,
যে বাণী বাহির হল প্রাচীন ভারতে,
সুধন্য জগৎবাসী অমৃতের পথে
সে গীতি উঠিল গাহি অসীম পুলকে!
মহান ভারত তাই একদা ভূলোকে
মহত্তর হয়েছিল সুকঠিন ব্রতে!
বাণিজ্যে, বিদ্যায়, কর্মে উন্নতির রথে,
হয়েছিল অগ্রগামী জগতের চোখে!—
প্রাচীর সে মহাসত্য আজিকার দিনে
জ্ঞানের বিমলালোকে উঠিবে উদ্ভাসি
মহান ভারতে যারা প্রতিক্ষণে চিনে,
তাহারা হেরিবে চাহি সবিস্ময়ে হাসি
নবীন তপস্যাবলে ধীরে দিনে-দিনে,
মহত্তর সে ভারত উঠিছে উল্লাসি!

আশ্বিন, ১৩৩৩

দিনমজুরের ছেলে

দিনমজুরের ছেলে,
হাসি-খেলা তার দূরে ফেলি দিল ঠেলে,
ক্ষুধার দহনে বসে আছে পথে জীর্ণ বসন মেলে!

ললাটে তাহার বেদনা-চিহ্ন এখনো রয়েছে আঁকা—
নয়নে তাহার কি যেন মিনতি মাখা—
কৌপীন পরি ফিরে পথে-পথে, অঙ্গ পড়ে না ঢাকা,
ভীত-কম্পিত-ত্রস্ত জীবন, আদর-সোহাগ পেলে,
ভয়ে-ভয়ে চায়, ছুটিয়া পালায় দিন-মজুরের ছেলে!

পিতা পড়ে থাকে বাহিরে কোথায়, মার স্নেহ নাহি পায়-
হৃদয়ের কিনারায়,
মমতা হারায়ে বাড়িয়া উঠে সে হায়!
কোমলতা হয় পাষাণের মতো সঞ্চিত বেদনায়!
শেষে দেখা দেয় সভ্যতাশিরে ধ্বংসমশাল জ্বেলে,
চিরবঞ্চিত লাঞ্ছিত চির দিনমজুরের ছেলে!

এরা আসি যেন তুলে কলরোল জীবনসিন্ধুতীরে,
বলে,—আমাদের দাবি দাও গো মোদের ফিরে!
চলে, নিশার বক্ষ উল্কার মতো চিরে—
কহে, তুমি তো পাষাণ নও,
আমাদের ব্যথা কিছু বুকে তুলি লও,
ক্ষুধিত, ব্যথিত, পঙ্গুজীবন কণ্টকপথে বও!
যদি বোঝো ভার, দিও পথ-'পরে ফেলে ;
সাগর-বেলায় আসে দলে-দলে দিনমজুরের ছেলে!

সন্তোষহীন জীবন তাদের এমনি বাড়িয়া চলে,
একদা তাহারা ফিরে আসে দলে-দলে—
দেশে-দেশে আসে ধ্বংসের সেনা রক্ত-পতাকাতলে!
সভ্য মানুষ ধুলায় লুটায় এদেরি দানব-বলে!

সহসা হেরিনু ফিরে চাহি ওই খোলার ঘরের নিচে,
শ্রমিক-জীবন চলিছে গোপন সারা জগতের পিছে—
আপনার পথ-'পরে,
তারা চলে বহি ব্যর্থপরান অসীম দৈন্যভরে—
দীনের বংশ বেড়ে চলে ধীরে নব ধরণীর ঘরে!

আজি তাই শুনি হায়,
মহাকল্লরোল মোদের জীবন-সাগরের কিনারায়।
শান্তিবিহীন ভিখারি কাহারা দ্বারে কর হানি যায়!

ভারতের বুকে হেরি দূরে-দূরে পল্লীপথের 'পরে,
এরা আসি ভিড় করে!
অর্থবিহীন, বিপুল ক্ষুধায়-তৃষায় জ্বলিছে মরে,
প্রতিদিবসের রোগ ও শোকের অশ্রু পড়িছে ঝরে!

জীর্ণবসন, শীর্ণশরীর হাসিখেলা দূরে ফেলে
মরণে রাখিল ঠেলে,—
বিধির সৃষ্টি-উপহাস-সম দিনমজুরের ছেলে!

কার্তিক, ১৩৩৩

মাটি

আমার মাটিরে আমি চিনি নাই, তাই,
অন্তর ভরিয়া মোর জাগিছে সদাই
অভাবের শীর্ণমূর্তি ; চির-ক্ষুধানল,
ঘূর্ণিবায়ু, মরীচিকা, পিপাসা সম্বল!
মাটির সে ভাষা কানে পশে নাই, তাই
উৎসহারা স্রোতসম কেবলি শুকাই
দিবসের খরতাপে। বর্ষা নাহি আসে,—
শ্যামরেখা নাহি টানে গম্ভীর সম্ভাষে।
আজি দূর পরবাসে পড়িতেছে মনে,
প্রদীপ জ্বলিছে কোন্ গৃহের প্রাঙ্গণে
তুলসীর মঞ্চতলে। গাভী এল গেহে—
সুপ্তিমৌন, শান্ত গ্রাম স্তব্ধ চিরস্নেহে!
শুধু মোর মূক মাটি রয়েছে জাগিয়া—
যারা দূরে গেছে চলে তাদেরি লাগিয়া!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

দুর্লভ

তোমারে আমি জীবন ভরি খুঁজিনু মনে-মনে—
কারণে-অকারণে
কত না দুঃখে, কত না সুখে কত মিলন-ক্ষণে—
নবীন নব শিশুর মুখে, হাসির রেখা-সনে!

আজিকে মোর নয়নদুটি ভরিয়া উঠে জলে,
কখনো কোনো ছলে,
শ্রীহীন মনে গোপনে যেথা বেদনাশিখা জ্বলে,
আসনি নেমে! তাই তো সেথা মরিনু পলে-পলে!

আমারি পথে চলিতে মোর শিকল বাজে পায়ে,
দাঁড়ায়ে গায়ে-গায়ে
হাজারো জন, হাজারো মন—শাসন ভাসে বায়ে,
তোমারে পাব নাহি সে ক্ষণ পরান ভরে ছায়ে!

নিজেরি মাঝে ডুবিয়া রহি, মরি যে তিলে-তিলে,
সময় নাহি মিলে!
জীবনভার বাড়িয়া উঠে—তুমি তো নাহি নিলে,
দীর্ণ মোর পর্ণপুটে অমৃত নাহি দিলে!

হে চিরপ্রিয়, চলেছি পথে, সহজ হবে কবে?
টানিয়া মোরে লবে
মায়েরি মতো চুমিয়া মুখ ডাকিবে স্নেহ-রবে,
গরবে মোর ভরিবে বুক, সহজ হবে যবে!

তোমারে সদা ভুলিয়া যাই ঘূর্ণিস্রোতমাঝে
চিরনবীন সাজে,
মরণে বসি হাসিছ তুমি স্মরণে রহে না যে!
জীবনে তুমি সহজে চুমি রহিলে মনোমাঝে!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

ভালোলাগা মোর ভালোবাসা হবে কবে

এই বসুধার শ্যামল আঁচলখানি
পরান-পরশে হরষের রেখা টানি!
চিত্ত-চকোর নবীন-দরশ মাগি
চলে নিশিদিন নব-নব অনুরাগী!
রূপ হতে রসে, রস হতে রূপে ধেয়ে
ফিরিছে জীবন চঞ্চল গান গেয়ে,
বলে,—চল্‌-চল্‌!—বিপুল চলার বেগে
নূতন প্রভায়, নবীন আশায় জেগে!
তাই চলি ধেয়ে পিছনে ফেলিয়া সবে,
ফিরে ডাকে কারা ব্যাকুল আর্তরবে!

বিদায়-পথিক চলিছে এমনি করে!
ক্রন্দন কার পিছনে টুটিয়া ঝরে
ভগ্নপরান তিক্ত ব্যথার ভারে,
নীরবে লুটিছে পাষাণ-পথের পারে।
মন্থর বায়ু জমিছে তাদের শ্বাসে,
দাঁড়ায় তাহারা পায়ে-চলা-পথ-পাশে!
গতিরে তাহারা গোপনে টানিয়া রাখে—
শিহরে পথিক করুণ আর্ত ডাকে!
তবু চলে যায় পিছনে ফেলিয়া সবে—
ভালোলাগা তার ভালোবাসা হবে কবে?

জীবনে আমার আজি যে আননগুলি
লুকায় গোপনে স্মৃতির বাঁধন খুলি,
তাহাদের কবে ভালো লেগেছিল মনে,
ভুলেছি কখন বেদনা-ভাবনা-সনে!
ক্ষণিক অতিথি ফিরিয়াছে দ্বারে-দ্বারে—
ভালোলাগা তার ভালোবাসা হল না রে!

ভালোবাসা হায়, কোন্‌ সে পরশমণি,
তাহারি লাগিয়া প্রহর বসিয়া গণি।
জীবনে মরণ মিশিছে গভীর রবে,
ভালোলাগা মোর ভালোবাসা হবে কবে?

পৌষ, ১৩৩৩

গোপনচারী

অন্তর-প্রান্তর-পারে হে সন্ন্যাসী, চিনেছি তোমায়
তমোময়ী রজনীর সুগম্ভীর তিমির-ছায়ায়।
হে ধ্যানী, তোমারি লাগি অশ্রুজলে কাটায়েছি দিন
গ্লানির মুহূর্তে মোর সুরহারা জীবনের বীন
মহা দৈন্যভরে,
গাহে নাই পূর্ণগান, হৃদয়ের মৌন শ্রোতা লাগি
ব্যথিত অন্তরে!

সুদুর্লভ, তোমা লাগি পুঞ্জীভূত বেদনার বাণী
নিরাশার করতলে রাখিয়াছি ধীরে-ধীরে আনি।
আজি এ তিমিরতলে চিনিয়াছি আনন তোমার,
জীবন-মাল্যের মোর গ্রন্থিহীন শুষ্ক পুষ্পভার—
আজি তোমা লাগি
একে একে দিব তুলি শীর্ণ তব করপুট ভরি
হে মোর বৈরাগী!

কত দিন, কত সন্ধ্যা, কত রাত্রি ফিরেছে সবেগে,
আমার জীবন ঘিরি নব-নব রূপরস লেগে,
তৃণের অঙ্কুর যেথা, সেথা ধীরে ফুটিয়াছে ফুল,—
আতপ্ত প্রাণের রসে গাঢ়তম সুধাসমতুল
আশীর্বাদ-ধারা
চাহি নাই, ফিরিয়াছ ম্লানমুখে অস্তাচলপারে
যেন বাণীহারা!

সেথা ছিলে তপস্যায় দীর্ঘকাল মোরে প্রতীক্ষিয়া
বিজন নির্বাস দেশে গুহাহিত আমারি লাগিয়া!
ফিরায়েছি বারে-বারে দ্বার হতে নির্দয়ের মতো
অকম্পিত করুণায় নেত্রদুটি করিয়া আনত,
হে গোপনচারী,
হাসিয়াছ ম্লান হাসি, ফিরিয়াছ দূর হতে দূরে
গ্লানি অপসারি।

তিলে-তিলে মোরে তুমি চাহিয়াছ ওগো সঙ্গহীন,
আপন বক্ষের মাঝে একেবারে করিতে বিলীন,
মিলনসঙ্কেত তব দুর্দিনের অন্ধবারিধারে,
নিঃশেষে মিলায়ে যায়, সীমাহীন সুদূর পাথারে—

আমি রহি বসি।
জীবন-কুসুম মোর ফুটি উঠি সৌরভ বিলায়
পবনে নিঃশ্বসি।

শীত, গ্রীষ্ম সুখদুঃখ হে গম্ভীর, স্পর্শে না তোমায় ;
দিনের পশ্চাতে দিন অন্ধবেগে ছুটে চলে যায়!
নীহারিকা-আবর্ত্তনে জ্যোতির্বাষ্প শূন্যতল ঘিরে—
গতির চরম বেগে জন্মমৃত্যু-আবরণে ধীরে
তপস্বী আমার!
অন্তর-প্রান্তর-পারে জ্বলে তব হোমশিখা-খানি
দীপ্ত, দুর্নিবার।

জ্বলে তব হোমানল, ভস্ম হয় জীবনের গ্লানি,
নির্মোক খসিয়া পড়ে—বাহিরায় সত্য মুক্তবাণী।
শিবের প্রশান্তি ভাতে জীবনের যাত্রাপথ-'পরে—
ছলনার মোহভার দগ্ধ হয় ধীরে থরে-থরে!—
হয় বিনিঃশেষ,
দীপ্ত, তৃপ্ত নব মূর্তি আবরণ ফেলে ম্লানিমার
ঘুচে যায় ক্লেশ।

আজি তব ধ্যানলোকে হে তবস্বী, আসিয়াছি ফিরে-
জীবন-সেতারখানি ধ্বনি তুল একান্ত গম্ভীরে!
সুমহান্ কালস্রোত—বালারুণ ভাতিছে গগনে,
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও এই মহা প্রশান্ত লগনে
জ্ঞানের আলোকে।
সহস্র বন্ধনমাঝে স্মরি তব জ্যোতির্ময়ী বাণী
অসীম পুলকে!

পৌষ, ১৩৩৩

স্বপ্ন-প্রয়াণ

হে স্বপ্ন আমার—
ডাকো মোরে যেথা তব স্নেহঘন প্রশান্তি-আগার।
যেথা তব শ্রান্তিহীন মুগ্ধনেত্র সভাসদ্‌দল
নয়নে অঞ্জন টানি হবি লয় বাস্তব-সম্বল ;—
মধুপ-গুঞ্জনসম যাহাদের পাখার লীলায়

সহস্র অপ্সরোলোক ভাতি উঠি আপনি মিলায়,
যেথা দীপ অহরহ নব জ্যোতি করে বিচ্ছুরণ,
অপূর্ব বিলাসদ্যুতি, মরকত হিরণ-বরন—
যেথা তব নব সৃষ্টি, আপনার পূর্ণ অধিকার—
সেথা মোরে লয়ে চলো ধীরে-ধীরে হে স্বপ্ন আমার!

বাস্তবের অবিরাম লীলামত্ত তরঙ্গ-দোলায়,
ভ্রান্ত আমি, শ্রান্ত আমি কঠিনের প্রকট ব্যথায়।
হে স্বপ্ন আমার!
আজি তুমি খুলে দাও গুপ্ত তব অমরভাণ্ডার!
তোমার সে রাজকোষ,— প্রাচুর্যের মহা আয়োজন—
স্তরে-স্তরে সাজায়েছ নিখিলের নয়ন-রঞ্জন—
আপনার মনে,
হৃত চেষ্টা, মৃত প্রাণ, স্তব্ধগান যেথা সংগোপনে,
তোমার কুহকদণ্ডে পেল প্রাণ, সুর সমাবেশ—
যেথা তব মায়াংশুকে আনিয়াছ আতপ্ত আবেশ
লীলাভরে মন্ত্রজাল টানি
ভাষা দিয়া বেদনারে আনিয়াছ সন্তোষের বাণী।

ছায়াময় তব কুঞ্জবনে,
শাখে-শাখে আলিঙ্গন, পত্রে-পত্রে নিবিড় গুঞ্জনে,
চলে ধীরে তব ভাষা অনাহত, মধুর গম্ভীর ;
শুধু ছায়া—ঘনছায়া ; সুসংহত স্তব্ধ বাপীনীর—
সেথা নাহি কলোল্লাস উঠে,
অভিনব মরালের স্বর্ণময় সিক্ত পক্ষপুটে
সমারোহ নবীন শুক্তির,
সকলি নবীন যেথা, যেথা গান আনন্দ-মুক্তির,
সেথা সুচরিতে,
আমারে টানিয়া লহ মুগ্ধ করি মধুর সংগীতে।

হে কবিসঙ্গিনী,
আদিযুগ হতে তুমি লীলাময়ী অনন্ত রঙ্গিণী।
অপরূপ তোমারি লীলায়,
ছন্দ-ভাব-কাব্যস্রোত কালস্রোতে আপনি মিলায়।
প্রতিভার নবোন্মেষে নব-নব সৃজনের সাথে,
তোমার সে লীলাপদ্ম দুলাইছ তরঙ্গ-আঘাতে।
সুবর্ণপরাগরেণু-পরিমল ভাসি যায় স্রোতে,
চিত্ত মম অলিসম ধেয়ে চলে অন্ধকার হতে।

ওগো মঞ্জুভাষা,
ঘন নীল নিশীথের ইন্দ্রজালে মোহিয়া নয়ন,
আমার অন্তরতলে ধ্বনি তোল একটি সে আশা—
আমার হারানো সুর ধীরে-ধীরে কর গো চয়ন।

ধরার বসন্তে আমি যাপিয়াছি যে দিবসগুলি,
কল্পনার করস্পর্শে পাসরিয়া কোলাহল-ধূলি,
আমার সে ধ্যান-লগ্ন মৌন বীণা তুলিবে গুঞ্জরি।
সুরে তার ধীরে-ধীরে ঝরি
পড়িবে শ্যামল তৃণে সুকোমল কুসুম-মঞ্জরী।

ভূতলের স্বর্গে মোর দিবে তুমি নব রস-ধারা—
তন্দ্রাহীন চন্দ্রালোকে জীবনের বদ্ধ অন্ধকারা
ভাঙি ফেলি বাহিরিব তোমার বিচিত্র পথ-'পরে—
নব-নব প্রেরণার লাগি—
মুক্তিস্নানে স্নিগ্ধ প্রাণ অপরূপ আনন্দের ভরে,
কোমল পরশে তব জরা হতে উঠে যেন জাগি।

আজন্মের সহচরী, লহ মোরে আলয়ে তোমার।
গ্লানিহীন লীলাভরে এ আসন ছাড়িয়া আবার
মানস-সন্ধানে প্রাণ যেতে চায় ব্যাকুল তৃষ্ণায়—
অশ্রান্ত পাখায়

অদৃশ্যচারিণীদল ক্ষণে-ক্ষণে করিছে চপল,
কর মোরে ব্যাকুল বিহ্বল,
তারপরে কবিদের পরিচিত ছায়াপথ ধরি
দূরে-দূরে লয়ে যাও তিমিরের লহর মুখরি
নূপুর-আঘাতে,
নব যবনিকা তোল জীবনের অভিনয়-রাতে।

মাঘ, ১৩৩৩

সখা

প্রণয়-বন্ধনে সখা, বাঁধিয়াছ এ দীন হিয়ায় ;—
কৈশোরের উৎসুক লীলায়।

অতীত দিনের কথা—কবে মোর মুখপানে চেয়ে
বলেছিলে কোন্ কথা, ফিরেছিলে কোন্ গান গেয়ে

আজি একা-একা
নিশীথের অন্ধকারে স্মরি বসি—নাহি তব দেখা।

দেখা নাই ; তবু হায়, দীর্ঘ দিন চলিয়াছে ধীরে।
বঙ্কিম কুটিল পথে আপনার বিশ্রাম-মন্দিরে।
যেথা রাত্রি, সুগম্ভীরা আসে ধীরে নীলাঞ্চল পরি
বেদনার সাথে মোর জাগে মেলি আঁধার কবরী।
নিখিল-সুষুপ্তিমাঝে তারাদল চাহে মোর পানে ;
কি যেন হারায়ে গেছে!—সারা বিশ্ব ফিরে তারি ধ্যানে!

তুমি নাই ; আজি তাই ভ্রান্তমন ফিরে দ্বারে-দ্বারে
বিরাট অতৃপ্তি লয়ে, লয়ে ক্ষুধা, স্তব্ধ বেদনারে ;
সহস্র প্রশ্নের ভারে অবসন্ন দেহ-মন লয়ে,
মহাগ্লানি চিত্ততলে বয়ে,
আছি একা বসি ;
নির্জন মানসলোকে ফিরিতেছি তোমারে পরশি।

আমার মানসে আজি হেরিতেছি বিরাট প্রান্তরে,
তুমি, আমি চলিতেছি সুবঙ্কিম পথরেখা ধরে ;
ছায়াময়ী রজনীর শেষযামে দীপ্ত শুকতারা
মোদের যাত্রার পথে ছিল চেয়ে যেন নিদ্রাহারা!
শীতল শিশির-স্পর্শে তৃণদল আকুল অধীর—
ধরার নির্বাক শিশু ;—বহে শুধু নয়নের নীর!
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ ; উদয়ের আলো নাহি জাগে
তুমি মোর কর ধরি কহিতেছ, 'আগে, আরো আগে!'

সুদূরের পিপাসায় কণ্ঠ তব তৃষিত দারুণ ;
উদাসীন দৃষ্টি তব, বাণী তব একান্ত করুণ ;
সে দৃষ্টি ডাকিত মোরে, সে বাণী ভুলাতো বেদনায়,
আজি তাই অধীর হিয়ায়
তোমার পরশ মাগি আমার চিন্তার পথ-'পরে।
যে আশা জাগাতে প্রাণে, আজি চলি তাহারি নির্ভরে।
স্মরি—মহা-অন্ধকার, পুঞ্জীভূত ঘন-ঘোর কালো—
ঊর্ধ্বে মেলি হস্তদুটি—কহিতেছ, 'আলো, আরো আলো।'

হে তরুণ বন্ধু মোর, হে সুন্দর, হে চিরনবীন,
আলোর কামনা মোর প্রাণে তাই নহে-নহে ক্ষীণ।
তরুণ গরুড় জাগে মাতৃগর্ভে জন্মদিন চাহি—
দূর সুরলোক হতে অমৃতের মহাগান গাহি

তাহারে জাগিতে হবে ; তাহারে উঠিতে হবে শেষে
বেদনার বন্ধ টুটি সগৌরবে মহা-বীরবেশে।

নয়নসম্মুখে নও ; আজি তোমা স্মরিতেছি প্রিয়,
মধুর মাধবী নিশি, শান্ত বায়ু, যেন বা অমিয়।
এমনি বসন্তে কোথা মুখরিত বিহগের গীতে,
গোলাপের কুঞ্জতলে জ্যোছনায় একান্ত নিভৃতে
হাফেজ তোমারি গানে জীবনের কাব্যটিরে গাড়ি
বিশ্বজন-করতলে রেখে গেছে ; কত বর্ষ ধরি
তাহারি অমর বাণী প্রদানিছে সঞ্জীবনী-ধারা—
বিরহের অশ্রু তাই মরুভূমে হয় নাই হারা!

হে দরদী, দাঁড়ায়েছ পাশে ;
যুগে-যুগে বেদনায় শান্তি দিলে প্রসন্ন সম্ভাষে!
সুবিপুল রণাঙ্গণে, ধ্বংসস্তুপে বিষাদের মাঝে,
তুমি যে সারথি-বেশে দেখা দিলে অপরূপ সাজে।
শোনালে অপূর্ব বাণী ভয়-ভীত ক্লীব জনগণে,
গাহিলে গম্ভীর গান ভারতের বিরাট প্রাঙ্গণে।

তুমি মানবের সখা, বন্ধু তুমি, হে চিরভাস্বর,
বিপুল আশ্বাসবাণী ধ্বনি তুলি রাজরাজেশ্বর—
শুনায়েছ অদ্ভুত বারতা
সুমহান সন্ধিক্ষণে নবধর্ম-জনমের কথা!

হে নবীন, সখা তুমি, বন্ধু তুমি, তুমি প্রিয় মোর ;
বিপুল বন্ধনমাঝে হাস্যমুখে নিলে রাখী-ডোর।
সখারূপে সত্য তুমি ; তাই প্রাণ সদা তোমা চায়।
তব নীল নয়নের স্নেহঘন ব্যাকুল মায়ায়
রসধারা খুঁজে প্রাণ। তুমি তাই রহ না পাসরি
বেদনায় মথি হিয়া ভোলো নাই বাজাতে বাঁশরি।

ফাল্গুন, ১৩৩৩

জীবন-তটিনীপরে

[একটি বন্ধুর মৃত্যুর পরে]

জীবন-তটিনী-পারে বেদনার অন্ধকারে
শয়ন তোমার।

লহ প্রিয়, শেষ-উপহার!

চিরন্তন অবসান গেয়ে গেল মহাগান—
মরণসম্মুখে আজি শুনি তাই পাতি কান,
ব্যাকুল ব্যথায়—
মৃত্যু এল চঞ্চল পাখায়!

হে প্রিয়, মরণে আজি ভরেছ জীবন-সাজি!
নিয়েছ কি তুলে
ছিল যাহা প্রাণ-উপকূলে?
ব্রাহ্মণ, আজিকে তব স্মৃতিরে স্মরিয়া নব—
গান গেয়ে যাই।
গাঁথি বসি তোমারি কথা-ই!
অমর, তোমারি লাগি শশীতারা রহে জাগি—
বাসনা তোমার,
ফিরে-ফিরে আসে বার-বার।
অনন্ত অণুর মাঝে দুলিছ নবীন সাজে
অনির্বচনীয়,
মৃত্যুর অতীতপুরে হাসিয়া ফিরিছ ঘুরে
মোরে প্রাণ দিয়ো!

যাদের বাসিতে ভালো, তাহারা ভুলেছে আলো,
আঁধার—আঁধার!
তোমার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিও, বাসি—
ভালো বার-বার!

ক্ষয়েরে অক্ষয় করি বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ভরি
রাখিছেন যিনি,
তাঁরে মোরা এখনো চিনিনি।
তোমার চলার সুরে, চলে মন দূরে-দূরে
আপনা পাসরি—
বাজি উঠে মরণ-বাঁশরি!
সৃষ্টিরে প্রবাহ দিয়া দশদিশি সচকিয়া
বাজে ভেরী তার—
মনে হয় সকলি আঁধার!

তোমারে শেষের সাজে সলিল-সমাধি-মাঝে
বীরবন্ধু মোর,
অর্পিয়া চলিনু ধীরে সংসার-সাগর-তীরে
মুছি আঁখি-লোর!

৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

প্রথম বারিধারা

প্রথম বারিধারা, আজিকে হব হারা
আঁধারে!
আজিকে পথে আর নাহি যে নাহি আর
বাধা রে।
তৃষিতা ধরণীর নয়নে বহে নীর
নিদাঘে।
মাটির সব গান নীরবে অবসান
বিরাগে।
শ্যামল বৈভব, প্রদানি গৌরব
ধরা-তে।
রিক্ত সরোবর, নদী ও নির্ঝর
ভরাতে,
ফুটাতে তৃণফুল প্রকাশ-বেয়াকুল
ভুবনে,
বরষা এলে আজ নিবিড় ঘনসাজ
গগনে॥

প্রথম সৃজনের অচল তিমিরের
মাঝারে!
অগম মনোরথ রহিল মৃতবৎ
পাথারে।
সেথায় আজি মোর নীরবে লাগে ঘোর
নয়নে!
রহিনু জীবনের গভীর স্বপনের
বপনে॥

প্রথম বারিভার লহ গো উপহার
নীরবে।
আজিকে মানুষের বেদনা-হরষের
বিভবে।
প্রবীণ ধরা'পর তুমি যে সহচর
সৃজনে,
প্রদানো অঞ্জন নয়ন-রঞ্জন,
জীবনে॥

আজিকে ঝরি যাও ব্যাকুল দোলা দাও
হৃদয়ে,
সৃজন কোথা হায়? প্রলয় বহি যায়
আলয়ে॥

প্রথম বারিভার, টুটে না মোহ আর
এ-দিনে।
গভীর দীনতায় বায়ু যে বহি যায়
বিপিনে।

নিখিল-মানবের বেদনা আজিকের
আকাশে।
সৃজন কোথা তায় প্রলয় হেরি হায়
প্রকাশে॥

প্রথম বারিধার, বেদনা উপহার
লহ গো।
শেষের বিষ আজ করিল নব সাজ
বহগো।
সুনীলকণ্ঠের সাগর-মন্থের
বেদনা,
হরষে তুলি লও ; আপন শিরে বও
সাধনা॥

আজিকে মেদিনীর দীনতা-নত-শির
নমিছে।
ক্ষণের তৃণদল ভুঞ্জি ধারাজল
ভ্রমিছে।
তিমির দিগভরি জাগিছে শর্বরী
গোপনে,
ঝিল্লি আজিকার স্বনিছে ব্যথাভার
পবনে
বিধুর বেদনায় পরান আজি হায়
বাঁধা রে।
প্রথম বারিধারা আজিকে হব হারা
আঁধারে॥

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

দেহ-দেবতা

মোর দেহখানি—
অনির্বাণ হোমশিখা—ধীরে-ধীরে পাসরিয়া গ্লানি
যুগের জড়িমা ভেদি মোরে দিল আনি
বিধাতৃমহিমাদীপ্ত জ্যোতির্ময় জয়টিকাখানি!

অযুত পাখায়
ব্যাকুল নিঃশব্দ নৃত্যে কল্পলোকে যারা ভাসি যায়,
অদৃশ্য সৃজন-বেগে মুহুর্মুহু বাসনা-বিভায়,
তাহারা এসেছে নামি
পূর্ণ করি ধরিত্রীর ক্লিষ্ট দিবাযামী
মোর দেহ-তটিনীর অবিরাম প্রাণ-আন্দোলনে!
আজি তাই গগনে-গগনে
আনন্দ-আলোকলিপি আবর্তিছে প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে।

আমারে ঘিরিয়া নাচে অসংখ্য কামনা—
লীলামত্তা ধরণীর প্রাণ-আরাধনা,
গ্রহচন্দ্রতারকার লক্ষ-লক্ষ ভাবস্পর্শকণা,
দেহ-মঞ্জরিরে মোর ধীরে-ধীরে তুলেছে ফুটায়ে
ক্লান্তিহীন নিশীথের বায়ে!
প্রভাতের মনোরম জ্যোতির্বাণীটিরে—
নীরবে করেছে জপ দিবানিশি আলোকে শিশিরে।

চলা মোর শেষ নাহি হয়—
পথের কিনারে হেরি নব পথ—বনচ্ছায়াময়:
কভু মরুদাহশীর্ণ, কভু তারে হেরি জাগে ভয়।
দিনান্তের ম্লান রবি গোধূলির সাথে কথা কয়।
কভু দূর বাটে,
আশার নবীন স্বপ্নে কুহেলির জীর্ণ জরা কাটে।

মোর দেহ ভরি
জাগে কত কল-কথা—মুখরিত শ্রাবণ-শর্বরী।
কত বেদনার বাণী, ঝরাপাতা ম্লান ফুলবাসে,
লক্ষ ঋতু-বরষের পুঞ্জীভূত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে,
দেহ মোর মহীয়ান্; আজি তাই ভাসে,—
অনন্ত ইঙ্গিতময় বর্ণচিত্র-ভরা—
শ্যামশষ্পে পরিপূর্ণা জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা!

রূপ নহে ইন্দ্রজাল, রূপ মোর মহাসত্যবাণী ;
অরূপের আলিঙ্গনে প্রাণময় বলি তারে জানি!
এ বিশ্বের প্রকাশের ব্যথা
জীবন-ঘূর্ণন-স্তব্ধ ভাষাহীন যত ব্যাকুলতা—
দেহের মাঝারে মোর পেয়ে গেছে পরম সন্ধান!
মানুষের পরিপূর্ণ সাধনার গান,
দেহের মন্দিরা-তারে অহরহ ঝঙ্কারিয়া যায়!
অরূপের ছন্দোময় অপূর্ব ব্যথায়!

লক্ষকোটি বর্ষ-পরে মাটির প্রতীক্ষা-অবশেষ,—
আজি তার পেয়েছি উদ্দেশ!
দেহেরে প্রদীপ কহি, কহি কভু দেবতা-দেউল—
প্রেম তাহে কামনার পরিস্ফুট ফুল!
তাহারে ঘেরিয়া মোর নাচি যায় অন্তর-বাউল!

দেহ মোর নহে মায়া—
মিথ্যার স্বপন নহে, নহে শুধু মরীচিকা-ছায়া!
দেহ মোর নহে কারাগার—
রোগ-শোক-মলিনতা, শত গ্লানি, অযুত ধিক্কার—
উষার মেঘের মতো পলে-পলে হয় একাকার!
জাগে চিরন্তন,
অসীম আনন্দঘন দেহ মোর সুন্দর, শোভন!

মোর দেহখানি—
ধবল কঙ্কালমাঝে শেষ তার কভু নহে জানি!
কালের ব্যাকুল ছন্দে পরমাণু-বাণী
এ দেহ ঘেরিবে মোর—লীলানৃত্যে লবে তারে টানি!
শীর্ণ মোর কঙ্কালের মাঝে,
সুনবীন তৃণফুল দেখা দিবে নব্যতর সাজে!
মৃত্যুদীর্ণা ধরণীরে ধীরে-ধীরে দিবে আমি জানি
অনন্ত অমৃতবার্তা চিরন্তনী মোর দেহখানি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

কবি

আমি কবে জন্মেছিনু ধরিত্রীর চিরশূন্য কোলে
আজ তাহা মনে নাই—ক্ষমিও আমারে ;
উদাসিনী ছিল বসি,—পদপ্রান্তে নৃত্য-কলরোলে
ছুটিত উন্মাদ সিন্ধু, তরঙ্গের হারে,
ফেনশুভ্র মেখলায় সাজাইতে চাহিত প্রিয়ারে—
সৃজন-আনন্দময়ী চারু-নয়নারে!

লঙ্ঘিয়া পর্বতজঙ্ঘা খরবেগে আক্রমি শিখর
দেখা দিল একদিন ধরিত্রী-সন্তান!
সুবিশাল বক্ষ তার বিজয়ের বাণীতে মুখর,
দৃষ্টি তার প্রতি অণু করিছে সন্ধান!
ধরণীর সাগরের আকাশের গাহি মহাগান—
জন্মিলাম কবি আমি চিরমহাপ্রাণ!

সেদিন সাগর-শঙ্খ ফুৎকারিল উর্মির সংক্ষোভে
ওগো উদাসিনী ধরা, চাহো আঁখি মেলি—
অমৃত-পিপাসু নর কোলে তোর—সহস্র বিক্ষোভে
মরে নাই, মরিবে না—চাহো আঁখি মেলি।
রবি-শশী দুই নেত্রে বসুন্ধরা ক্লান্তি অবহেলি
দিবা-রাত্রি রহে চাহি আভরণ ফেলি!

সেদিন আমার চক্ষে ভাতিয়াছে আকাশের জ্যোতি
অনাগত পৃথিবীর স্বপ্ন বহি আমি।
রচিলাম রামায়ণ, সৃজিলাম রাম,—মহামতি—
সীতার বিরহ-গানে কাঁদে দিবা-যামী ;
রঘুর বীর্যের গাথা একযুগে রহিল না থামি ;
মন্থর মেঘের শ্লোকে অশ্রু এল নামি!

আমার সে প্রাণ-জ্যোতি আবরিল সারাটি ভুবন
অমারাত্রে জ্বালি গেনু স্বপ্ন-দীপশিখা!
নীরন্ধ্র আঁধার ভেদি তীব্র তীক্ষ্ণ বাণের মতন
ছুটিল সে ভাবীযুগ-নিশার দীপিকা।
নবীন-ধরণী-সৃষ্টি—সে আমার ললাট-লিপিকা
তরুণ গরুড়-ভালে অমৃতের টিকা।

কোটি-কোটি নরমুণ্ডে যে-জন রাখিল পদ তার,
আমি তারে তুচ্ছ করি গাহি যাই গান!

রক্ত-লিপ্ত বধমঞ্চে দেহ মোর দিনু শতবার
ঘাতক-কুঠার লঙ্ঘি মোর মহাপ্রাণ
ছুটি গেল প্রাণ-জয়ে,—দিনে-দিনে জীবন-সন্ধান ;—
ভয় নাই তার, যার নিত্য সুধাপান!

যতদিন ধরণীর বক্ষে রহি দেহ-ভার বহি,
ততদিন কে চিনিবে, কে জানিবে মোরে?
আকাশের তারা জানে কত তাপ অনুদিন সহি
বসুধার তৃণ জানে শ্যাম স্বপ্ন-ডোরে
কত তারে সাজাইব, এ মাটির পাত্র-খানি ভরে
কত রস পান করি নয়নের লোরে!

চাহি না ক্ষণের হাসি, ক্ষণিকের উচ্ছল নয়ন
মুহূর্তের লাগি কভু নহি যে কাতর!
আমি চাহি ধরিবারে ছন্দে মোর উদার গগন ;—
রচি যাব ধরণীর অমর বাসর
কবিতায় ;—মৃত্যু যদি চুম্বে ভাল, তবে তারপর
রহিবে আমারি পৃথ্বী—উদাস, অজয়!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

কল্যাণ-স্বপন

জনার-ইক্ষুর ক্ষেত দূর জন-পদ-সীমানায়
জীর্ণ-শীর্ণ বেড়া-ঘেরা ; মধ্যপথে আলবদ্ধ জমি,—
কর্তিত-হৈমন্তী-ধান্য ; —অনুর্বর, ঊষর, অসমী।
সরিষার ফুলে-ফুলে অবিশ্রাম মক্ষিরা বেড়ায় ;
শ্যামলের মেলা হেরি নেত্র মোর মর্মে মূরছায়
চিরদিন ; চিরদিন কেমনে যে তাহারে উপমি?
মানসের তৃষ্ণানাশী শোভা সেই ;—চিরদিন নমি।
আমারি মনের গান তারে ঘেরি নীরবে ঘনায়।

নীরবে ঘনাক্ আহা সে-দিনের শ্মশানের 'পরে
একটি করুণ জ্যোতি উদয়-অচল-প্রান্ত হতে।
সে মহানিদ্রার শীর্ষে আশীর্বাদ যেন থরে-থরে
বর্ষিয়া জাগায়ে দিক্ অবিরাম উদ্যমের স্রোতে

সফল কল্যাণ-স্বপ্ন। মহাদৃপ্ত সাহসের ভরে
মধুর কোমল হাস্য ফুটাইব গ্লানির মরতে।

মাঘ, ১৩৩৫

দুহিতার অশ্রু

শিশু সে দুহিতা মোর দিনমান খেলিয়া বেড়ায়
ধুলা মাখি সারা গায়ে কভু ফিরে উঠানে-উঠানে—
কভু উচ্চ হাসি শুনি, কভু নৃত্য করে কলগানে,
দুলায়ে ঝামর কেশ, দুষ্ট কভু ঝুমুর বাজায়,—
করতালি দিয়া-দিয়া আধ-আধ গান গেয়ে যায়!
একদিন হেরিতেছি—সাথী নাই, বসিয়া সোপানে,
কাঁদিছে বিধুরা মেয়ে, চাহিল না কেহ তার পানে,
ক্রন্দন বাড়িয়া উঠে, রুদ্ধস্বরে কেবলি ফোঁপায়।

আদরে লইনু কোলে, আঁখিজল মুছানু যতনে,
মনে হল, সারা বিশ্ব মনে-মনে এরি ধ্যান করে—
আপনার লীলাখানি তুলি দিবে সাথীর নয়নে,
প্রকাশিবে আপনারে। বেদনায় মর্ম তাই মরে।
চকিতে জাগিনু মনে—সে ব্যথা বসিয়া নিরজনে
আমারি বুকের মাঝে নিঃশ্বসিছে শুধু হা-হা স্বরে!

মাঘ, ১৩৩৫

দুরাশা

অনাদি ক্রন্দন মোর মর্মতলে আঘাতিয়া ফিরে ;—
কোটি-কোটি সিন্ধু-শঙ্খ ঘন ঊর্মি-বিভ্রম-চূড়ায়
শোভে যেন রৌদ্রালোকে ; কে যেন রে কেতন উড়ায়,
লঘু শুভ্র চীনাংশুক—মত্ত বায়ু নিত্য তারে ঘিরে।
সে কি ভীম আয়োজন!—বক্ষ যেন লক্ষ হয়ে চিরে
ধূলিতে মিশাতে চায় আপনার শ্রেষ্ঠ সাধনায় ;
সার্থক করিবে যেন প্রত্যহের তুচ্ছ ব্যর্থতায়!—
দ্বিধা তবু চিরদিন,—প্রাণ তাই গুমরিছে ধীরে!

এ কি আত্মনাশী তৃষা! নব-নব চিন্তারে জড়ায়ে
এ কি ক্ষোভ অহরহ! কি দুর্বার চিত্ত-বিমথন!
ভাষা এরে নাহি পায় ;—আশা তবু ঘুরায়ে-ঘুরায়ে
দেখে লয় হৃত রত্ন ; পঙ্গু যেন করিবে লঙ্ঘন
দুর্গম শঙ্কর-শৃঙ্গ! মনে হয়, শিখর ছাড়ায়ে
উঠিয়াছে বীর-শির—বিন্ধ্য নয়—চুম্বে সে গগন!

মাঘ, ১৩৩৫

পরিচয়

ধূলিপাণ্ডু রুক্ষ জনতায়,
দেখা হল তোমায়-আমায়!
যেথায় রৌদ্রের খেলা, পাংশু জীর্ণতার মেলা,
নয়নের বিজলি মিলায়—
দেখা সেথা তোমায়-আমায়!

হে বিদ্যুৎ, পরান-বাসিনী,
মন জানে, তোমারেই চিনি!
তবু সেই পরিচয় নির্জন গুহায় নয়
নয়, যেথা কঙ্কণ-কিঙ্কিণী,
মন জানে, তোমারেই চিনি!

বহুদূর আকাশে-আকাশে,
রথের ঘর্ঘর-ধ্বনি আসে ;
তারকার রেণুকায় পথ তার ছেয়ে যায় --
ছিন্ন-ভিন্ন মেঘবাষ্প ভাসে—
বহুদূর আকাশে-আকাশে!

সে-রথের উচ্চ চূড়া হতে
খসে ফুল ধুলার মরতে!
সে কুসুমে বাঁধি ডোর পদপ্রান্তে দিব তোর
সাধ ছিল ; জনতার স্রোতে,
তোরে হেরি ধুলার মরতে!

মিলায়েছে দিবসের আলো!
তামসিনী রজনী ঘনালো!

ধূসরিতা, সেই ক্ষণে, কালো কুয়াশার সনে
মোর মুখে পড়ে তোর আলো!
তামসিনী রজনী ঘনালো!

হে বন্দিনী, তোর ইশারায়,
পরানে আগুন ঝলকায়—
বক্ষের প্রশ্বাস মোর ছিঁড়িয়া বন্ধন-ডোর,
তোমারই মুক্তির পথে ধায়!
পরানে আগুন ঝলকায়!

ভিখারিনী চেনো এইবার,
এসেছে সে রাজার কুমার!
লাখো জন-জনতায় চিনিতে নারিলে যায়-
তারি কণ্ঠে দাও তব হার!
ভিখারিনী, চেনো এইবার!

বিষাদিনী, চেনো তারে চেনো,
তোমারই সে কবি, তারে জেনো!
তোমার দূরের আশা, তাহারই কণ্ঠের ভাষা,-
মুক্তির চারণ বলে মেনো!
বিষাদিনী, চেনো তারে চেনো!

পৌষ, ১৩৩৬

পুরুষ

আমার সম্মুখে অন্ধকার, আলো হাতে নাই কোনোজনা-
আকাশে তারকা নাই—লক্ষ-লক্ষ বাদুড়ের দল
তীক্ষ্ণ চর্মগন্ধসনে নিশারে করিছে অভ্যর্থনা—
হে পুরুষ, এই তো সময়!
অমৃতের আশা নাই—পান কর তীব্র হলাহল ;
জীবন-সরোজ-রাগ সে তো শুধু অলীক কল্পনা—
সত্য বলে মানো পরাজয়—.
হে পুরুষ, এই তো সময়!

জাগো-জাগো হে প্রথম নর,
প্রস্তর-কঠিন হিয়া, রক্তচক্ষু, উলঙ্গ, প্রখর—

জাগো এইবার!
পাষাণী ধরার বক্ষ বিদারিয়া আনো ক্ষীরধার!
শিরাল দক্ষিণহস্তে রাখো শুধু অসীম নির্ভর!
বধূ তব পীনস্তনী, বাম করে লহ তারে পাশে—
তারপরে চলো পথ—পাংশুল, ধূসর!
জাগো, জাগো হে প্রথম নর!

স্ফার বক্ষ বহি-বহি অস্ত্রাঘাতে নামে রক্তধার ;
নয়নে ঘনায় ছায়া আসন্ন মৃত্যুর—
তবু পথ, শুষ্ক দীর্ণ নিদাঘের খর মরুপথ—
পিপাসার্ত ক্লান্ত নারী—আরো দূর, চলো আরো দূর!
দেবতা কোথাও নাই, গঙ্গা নাই,—সবই মৃতবৎ,
শুধু আছো তুমি বন্ধু, আর আছে শাণিত তোমার
শত্রুরক্তপায়ী সেই ঝকমক তীক্ষ্ণ তরবার!

জাগো, জাগো হে বীর প্রথম,
আপনি জ্বালাও আলো, অন্ধকার রবে চিরদিন—
চিরদিন গাঢ় মসী—তারি মাঝে আনো গো বিষম
কলকল জলস্রোত, নিজ হস্তে ধরো গো কুঠার!
স্রষ্টা তুমি জেনো আপনার—
পরম করো সে আয়ু, যে আয়ুরে বলে সবে ক্ষীণ!

জাগো, জাগো কবির অন্তর,
হে পুরুষ, জাগো আজি, হে নির্ভীক, হে প্রথম নর!
বাজিয়াছে রণভেরি—শঙ্কা হরো হে মহাশঙ্কর!
দাও সেই মহাবহ্নি, স্বপ্নে মোর লাগাব আগুন,—
হে পুরুষ, এই তো সময়!
লোকালোকগিরি লঙ্ঘি সে শিখার চঞ্চল সঞ্চয়—
সত্য বলে মানি শুধু জয়!
হে পুরুষ এই তো সময়!

চৈত্র, ১৩৩৬

আমার এ কাব্যলোকে

আমার এ কাব্যলোকে কোথা হতে জানি না কখন
বহে যায় বৈশাখের ঝড়!
মনের বেণুর দল নুয়ে পড়ে ;—ছোঁয় না গগন
থেমে যায় সহজ মর্মর।
থেমে যায় দক্ষিণার গান,
থেমে যায় মুখর পরান ;
কারা বলে বার-বার, জাগো, জাগো, ওগো কবি-মন,
কালো হল দিবস প্রখর—
কালো হল!—ছায়া কার? হু-হু হু-হু শুনি গরজন
ধেয়ে আসে কালান্তের ঝড়!

চলিলাম দ্বার খুলে—রুদ্ধ দ্বার বহু-বহু কাল,
ঝাপ্‌সা চোখের 'পরে মোর—
কঠিন কাঁকর লাগে—মুখে লাগে সঞ্চিত জঞ্জাল!—
ছিঁড়ে যায় যত্নে-রচা ডোর!
ছিঁড়ে যায় মালাখানি তার—
ভেঙে পড়ে হৃদয় কাহার!—
কোনো অবসর নাই—ধেয়ে চলি আজ হতে কাল
পরানে যে মরণের ঘোর—
দ্বার খুলে চলিলাম, রাত্রি নাই নাহিকো সকাল
ছিঁড়ে যায় যত্নে-রচা ডোর।

আমার সে পথে আমি হেরিলাম কলের পুতুল—
হেরিলাম মেষধর্মী নর—
কতদূরে পথ তার? নির্বিকার, নাহি কোনো ভুল,
প্রশ্ন নাই—চলিয়াছে জড়।
শোনো, শোনো, সে মৃত্যুর মাঝে
আমার পরান বাজে না যে!
একপাশে রহিলাম—ঝরে যায় মনের বকুল,
প্রতীক্ষায় চিত্ত থর-থর—
হেনকালে মনে হল, আসিলে কি হে চিরব্যাকুল
অসংশয়ী কালান্তের ঝড়!

সে মহানির্ঘোষ, গুরু, আজি মোর কণ্ঠে লব শিখে
লব সেই ধুলার সংগীত,

বিমান আলোড়ি তুলি বাণী মোর যাক দিকে-দিকে
অচেতনে দিবে সে সম্বিৎ।
শোনো, শোনো, স্বপনের 'পরে,
লেলিহান্ অগ্নিশিখা ধরে—
কুসুম-আয়ুধ আজি ভস্ম হল নিমিখে-নিমিখে
লহ কবি পরম ইঙ্গিত—
সে মহানির্ঘোষ, গুরু, কণ্ঠ ভরি লইলাম শিখে
তুলিলাম ধুলার সংগীত!

একটি প্রাণের স্পর্শ চেয়েছিনু এই ধরণীতে,
হোক না সে দীনতম, দীন—
একটি মানুষ চাহি নির্বিকার জড়ে প্রাণ দিতে—
চলে যায় লক্ষ রাত্রি-দিন।
বহি-বহি আপনারে তাই,
আমার ক্লান্তির সীমা নাই!
খরদীপ্তি মধ্যদিন, পিপাসার্ত জীবন বহিতে
সাধ নাই—আশা হয় ক্ষীণ—
কোথায় সে প্রাণবহ্নি? লব তারে এই ধরণীতে
হোক না সে দীনতম দীন!

বিশীর্ণ কঙ্কাল হেরি চোখে মোর ধাঁধা লেগে যায়—
পুরুষের কণ্ঠ নাহি আর!
'নারীরে লভে নারী'—মহাভঙ্গি সিংহ সে কোথায়—
—মেঘসম গর্জন গুহার?
পিঙ্গল কেশর-মাঝে ওই,
ক্ষুধাদীপ্ত নেত্রদুটি কই—
অসাড়-পাষাণে যেই রক্তলেখা হেরিবারে চায়—
গজমুক্তা নখরে যাহার—?
দু-পাশে কঙ্কাল ঠেলি পথ-চলা হল আজি দায়
পুরুষের কণ্ঠ নাহি আর!

আমার এ কাব্যলোকে তাই বহে বৈশাখের ঝড়,—
আমি চাই নূতন জগৎ,
নুয়ে পড়ে শিশুতরু, থেমে যায় সহজ মর্মর
চাহি না রহিতে মৃতবৎ!
সূর্য, তুমি সরে যাও দূরে—
পবান-গগন মোর জুড়ে

কালো-জটা মরুতের নৃত্য হোক—পৃথ্বী থর-থর
উড়ে যাক মৈনাক পর্বত!
কবে দেখা দিবে পৃথু? তারি 'পরে আমার নির্ভর—
আমি চাই নূতন জগৎ।

চৈত্র, ১৩৩৬

শুধু কবি

মেশিনের ঘূর্ণীধূমে যে আকাশে জ্বলেনাকো তারা,
যেখানে ধূলির মতো চূর্ণ হল আশা ও বাসনা,
যেথায় প্রাণান্ত শ্রম, নিঃশ্বাসের অবসর নাই,
আলো আসে ভয়ে-ভয়ে গলিপথে সুড়ঙ্গের দ্বারে,
ছায়া যেথা অধীশ্বর, যেথা ঘুরে টাকার চাকারা
সীমাহীন বর্ণহীন পথে,—নগরী সে শবাসনা—
ধাত্রী নয়, অঙ্গুলি-হেলনে তার ছুটিছে সদাই
দীর্ঘপথ, শীর্ণদেহ—শুষ্কমুখ কশার প্রহারে!

সেখানে দেখেছি আমি সঙ্গীহীন ক্ষীণ গৌরতনু,
শুনিতে চাহিছে প্রাণে বহু যুগ-যুগান্তের ভাষা—
গাহিতে চাহিল কণ্ঠে সিন্ধু-তীর-অরণ্য-মর্মর,—
বহে চোখে চিরদিন সাগরের শীকর-কণায়,
শীতল শৈবালে আর জনহীন সানুতে যে অণু
নিঃশব্দে জাগিয়া থাকে—তারি 'পরে একি এ দুরাশা!
কোলাহল তোমাদের, সে শুনিছে মুখর ঝর্ঝর
আত্মার অতল দেশে,—ভাসিছে সে সুরভি হাওয়ায়!

উদাসীন, মনে হয়, তোরি লাগি রজনী আমার
হয়েছে মদির-রূপা! চলে গেছি পাখা ভর করি
যেখানে মিলেছে গঙ্গা সাগর-দ্বীপের কাছাকাছি,—
দুলিছে ফুলিছে সিন্ধু, পাঠাইছে জোয়ার-বারতা
শ্রান্ত দুটি কপোলে প্রিয়ার ; তলহীন সে পাথার—
হিন্তালের বনভূমি, শব্দহীন গহন শর্বরী,—
সুশীতল কলধ্বনি—এক বাণী, 'আছি, আমি আছি'—
উপরে জাগিছে চন্দ্র, কবি সে-ও, সে-ও কহে কথা!

মাঘ, ১৩৩৭

ভাবী মানব

কতকাল চেয়ে রবে ওই মাঠে ওগো কাঙালিনী,
মরা বিলে, জনশূন্য ক্ষেতে? কে আসিবে ধূলিপথে
তোমার মলিন বাসে, ছায়া-ঘেরা দীন আঙিনায়?
গহন অরণ্যে তব কোন্ আশা হে নিরাভরণা,
পুষিছ অনন্তকাল ধরি? দিবা, আলোক-মালিনী
নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে যেথা শুধু বটে ও অশথে
ফেলেছে জটার জাল ; একা শশী জাগ্রত নিশায়
দূর তারা-লোকে জাগে ; কাঁদে রাত্রি অসিত-বরনা।

নাহি কি সন্তান কেহ দৃঢ়ব্রত পুরাণের বীর—
তোমার বন্ধন খুলি ছুটে যাবে বাহির-জগতে,
নীরবে সংগ্রাম করি ক্ষতদেহে জয়মাল্য ধরি
আসিবে তোমার ঘরে সৌম্যমুখে সম্পদ বহিয়া?—
নাহি কি তেমন কেহ? তবে কেন সারাটি রাত্রির
কঠোর প্রতীক্ষা বহি একা জাগো শুভ্র রুক্ষ পথে,—
ভিখারিনী, কহ মোরে, কে নিয়েছে রত্ন অপহরি?
কতকাল এ দীনতা রবে তুমি নীরবে সহিয়া?

বিধাতা, আমারে শুধু দিলে এই লেখনী তোমার,
দিলে দৃষ্টি দেখিবার—ধরা খুলে মর্মের বারতা!
দিলে না পাষাণ-বাহু, দিলে শুধু গভীর হৃদয় ;
একবার খুলে দাও ;—যেথা রাখো শক্তির নির্ঝর
সেথা হতে মন্ত্র লব, মূর্তি গড়ি দিব কল্পনার
গড়িব এমন নর, কর্মী যেই, কহেনাকো কথা—
গতিহারা সৃষ্টি তব সে করিবে নব প্রাণময়—
জানি তারে বাধা দিবে, তবু তার অসীম নির্ভর!

মাঘ, ১৩৩৭

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

মোরা বলি, 'আর কেন?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর
নবযুগ-মধুচ্ছন্দা! মধ্যাহ্নের হল অবসান ;
ছায়া হল দীর্ঘতর ;—পূরবীতে যে করুণ তান,

বাজিছে কম্পিত সুরে, তারো শেষ ; গাঢ় কণ্ঠস্বর!'
মোরা বলি, 'কোথা' গাও?—নগরীর বিলাস-সাগর
দুলিছে কি তব সুরে? কিম্বা কোথা সে বলিষ্ঠ প্রাণ—
যে ধরিবে বজ্রকণ্ঠে পরিত্যক্ত তোমার বিষাণ?
ছায়া এল ; কেন আর?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর!'

দূর হতে কারা কহে, 'নহে, নহে আরো কিছুকাল!
না ফুরাতে শেষরশ্মি গোধূলির অস্ফুট প্রবাহে,
কবি! তুমি ক্লান্ত করে লেখনীর শেষ রক্তদানে
ঘুচাও এ মৃত্যু-তৃষা! ওই দুটি নয়ন বিশাল
না মুদিতে, স্পর্শে তার স্নিগ্ধ করো বিশ্বের প্রদাহে!
জীবন রচিব মোরা মৃত্যুজয়ী তোমার ও গানে!'

আষাঢ়, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

(কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে)

তুমি রবি আকাশের, হিরণ্ময় রথ-সমাসীন—
বৈদূর্য-মুকুট শিরে, আপিঙ্গল অরুণ-সারথি
সপ্ত তুরগের রশ্মি দৃঢ় মুষ্টিতলে—তূর্ণগতি
ধায় রথ—ছিন্নমেঘবাষ্পচূর্ণ আবর্তে বিলীন,
জ্যোতিস্রোতে ভেসে যায়—এ উপমা আমাদের নহে।
অথবা যে 'অ্যাপোলো'র স্মিত হাসি ফুটালো ভাস্কর—
সূর্যের দেবতা যিনি, সপ্ত অশ্ব যাঁর রথ বহে,
সুঠাম সুন্দর মূর্তি,—'লরেল-পল্লব'—শিরোপর,
কল্পনা নামিছে তাঁরে, কিন্তু সে যে কানে-কানে কহে,—
'কবি যে স্বর্গের নহে—মর্ত্যলোক করে সে ভাস্বর!'

হে মানব, জীবলোকে ক্ষণ-স্বর্গ করেছ সৃজন,
সে তব অমোঘ স্বপ্ন ;—সেথা মোরা লভিনু বিশ্রাম।
রৌদ্রদগ্ধ, শ্রান্ত তনু—পল্লবের ছায়া লভিলাম।
শ্যামস্নেহমুগ্ধদৃষ্টি লভিলাম মর্মর-বীজন।
নেত্র ভরি এল অশ্রু, কণ্ঠ মোর স্তব্ধ হল গানে—
গান নয়—যেন বাজে অপ্সরীর চরণ-নূপুর ;
মনে হয়, সুখস্বর্গ এল বুঝি ধরার বিতানে,

একসাথে উঠে গন্ধ, গাঢ় ধূম ধূপ-অগুরুর—
বহুদুরে বাজে বাঁশি, মাতে প্রাণ অধীর সন্ধানে—
যত তাপ, যত দাহ মনে হয় সকলি মধুর।

এ স্বপ্ন মিলায়ে যায়, সূক্ষ্ম এই সুর-মূর্তিগুলি
জীবনের রুক্ষপথে খণ্ডে-খণ্ডে ধূলিতে লুটায়—
উচ্চকিত রাজপথে ত্রস্ত, ক্ষুব্ধ ঘন জনতায়
মাধুর্য হারায়ে প্রাণ নিরন্তর উঠে যে ব্যাকুলি!
মোরা চেয়েছিনু শুধু প্রাণ ভরে লভিতে নিঃশ্বাস,
যেথা তুমি আন্দোলিছ নিরন্তর সংগীত-সুরভি
তরলিত কণ্ঠস্বনে, ভাবনার স্বচ্ছ অবকাশ
যেথা তুমি বিস্তারিছ এ বিশ্বের প্রাণ-স্পর্শ লভি
গম্ভীর, নির্মল মন্ত্রে! আমাদের ধূসর আকাশ
বিষনীল হয়ে উঠে—ভুলে যাই শান্ত ধ্যানচ্ছবি।

প্রাচীরে পাংশুল রেখা—জনাকীর্ণ বসতির মাঝে
দাসজীবনের গ্লানি বহি চলে অযুত ধিক্কার,
গোপন অশ্রুর ফল্গু, কঙ্করের মাঝে হাহাকার—
জড়তার মহাস্তূপে শুনিতেছি সুগভীর লাজে!
তাই, বড় সংগোপনে তব গান রেখেছি লুকায়ে
নিভৃত মুহূর্তমাঝে—যবে অশ্রু উঠিবে উচ্ছলি
অকারণে চৈত্র-রজনীতে, উদাস বসন্ত-বায়ে
শৃঙ্খল মোচন করি অন্তরের কানে-কানে বলি
তব উদ্বোধনী বাণী—শ্রান্ত প্রাণ রাখি যে জাগায়ে
নব প্রভাতের লাগি স্তব্ধ করি কণ্ঠের কাকলি।

২৭ কার্তিক, ১৩৩৮

[বা স ন্তি কা]

প্রবেশক

শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ, এম. এস. সি. (লিভারপুল),
সুহৃদবরেষু

কাহারে হেরিলে বঁধু, সেইদিন মহুয়ার বনে?
যে ফুল ঝরিয়া পড়ে, তারি মাঝে পাতে সে আসন,
যে ঝড় ঝাপটি চলে তারি মাঝে উড়ায়ে বসন,
নৃত্য করে অহরহ, চঞ্চলিয়া নূপুর-নিক্বণে
দশদিশি, মুখরিয়া তন্দ্রাতুর জড়ের বন্ধনে
উচ্ছল উত্তাল রঙ্গে!—কভু খুলে সর্ব আভরণ,—
উদাসিনী বিধুরা সে—তপস্যার করে আয়োজন ;
ধুতুরার স্পর্শে তবু অশ্রু আসে অরুণ নয়নে।

সে কি তব যুগান্তের ব্যথাতুরা তাপসী বধূটি!
উদাস নয়নে তার শুনি আমি সৃষ্টি-কলরোল।
বিশুদ্ধ মানসে তব অম্লান সরোজ উঠে ফুটি—
অকস্মাৎ কী প্লাবন, কী মধুর পবন হিল্লোল
সুরভিয়া তুলে প্রাণ! কে যেন রে রত্ন মুঠি-মুঠি
নীরবে ছড়ায়ে দিল—থেমে যায় সে তৃষার রোল।

বৈশাখ, ১৩৪৫

বাসন্তিকা

১

পীত পাণ্ডু পত্রদল ঝরি যায় দূর বনান্তরে।
সজিনা ফুলের গন্ধে অধীর বাতাস।

পলাশ-শিমুল বনে লেখা হয় রক্তের অক্ষরে—
অয়ি গৌরি, তোমারি সে প্রেমস্বপ্নাভাস।

আজি চন্দ্রা-রজনীর তন্দ্রাস্তব্ধ মধুর বাসরে
উঠে দুলি সহকার—মুকুল-মদির!
তবু মোর রিক্ততায় ব্যথা-ম্লান উদাস অন্তরে
অপার্থিব শান্তি কোথা স্তব্ধ বনানীর?

অঙ্কুরের আশা নাহি। কেঁদে যায় শুক্লা মধু রাতি—
ওগো মুগ্ধা, সুচঞ্চল আঁখি-তারকায়
অশ্রুত সংগীত ছিলো, ছিলো দূর শশাঙ্কের ভাতি—
আজিকে স্মরিতে মন আপনা হারায়।

২

বনের মর্মরে তাই মর্ম মোর হয়েছে উদাস।
অজানা ফুলের গন্ধে পরান উতল।
অন্তর আকুলি তুলে সুমন্থর বসন্ত-বাতাস ;
—মনে জাগে স্পর্শাতুর উষ্ণ পাণিতল।

আমের মঞ্জরি লয়ে রেখেছ কি কবরী-সীমায়,—
গৌর দুটি স্তনতটে চন্দন-অঙ্কন।
যবাঙ্কুর-পাণ্ডু গণ্ডে আষাঢ়ের মায়া কি ঘনায়—
অধরের প্রান্তে আসি শিহরে চুম্বন!

সুদূরের ব্যথা নাহি। আসে ধীরে গহন, গভীর।
মহুয়ার মদ-গন্ধে বিভোল কানন।
নেবুর পুষ্পিত শাখে ভ্রমরা সে ব্যাকুল, অধীর।
বিধুর অন্তর ঘিরে মদির গুঞ্জন।

৩

শুনিলাম চন্দ্রালোকে ছল-ছল পদ্মার ক্রন্দন,—
ব্যাকুল সর্পিল নদী দিগন্ত-সীমায়!
কী অস্ফুট কালো ভাষা দুই তটে করিছে গুঞ্জন—
সে যেন তোমারি স্বপ্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায়!

কী গূঢ় গভীর গান নিরন্তর উঠিছে উচ্ছলি—
বন্দিনী সে নদী-নারী প্রেয়সী আমার।
দুঃসহ বন্ধনক্ষোভে কঙ্কণের জ্বালা উঠে জ্বলি—
তোমারি সে অশ্রু-জ্বালা চির-রিক্ততার!

গাহে গান তট-ঝাউ ঘনকৃষ্ণ স্পন্দিত শাখায়—
সুদূর সীমান্ত-মসী একান্ত বিলীন।
কিশোর তপন জাগে আরক্তিম অরুণ-পাখায়!
ক্রন্দনে স্বপনে মিশি আসে দীর্ঘ দিন।

৪

যে মালা শুকায়ে যায় উৎসবের শেষ রজনীতে,
যে হাসি মিলায়ে যায় অধর-সীমায়—
ফাল্গুন তুলিল তান দক্ষিণার ব্যগ্র বাঁশরিতে—
সে হাসি-মালিকা হেরি নব-মল্লিকায়।

আজিকে যৌবন, সখি,—গীতময়ী পূর্ণা নিশীথিনী–
প্রসন্ন ললাটে আজি শ্রান্তি-রেখা নাহি।
অনশ্বর প্রেম-মন্ত্রে ওগো মোর প্রাণ-সীমন্তিনী,
জীবনের মধুস্রোতে দোঁহে অবগাহি।

তুলে দাও সুধাপাত্র—যবে হায় বেদনার দিন
শ্যেনসম তীব্র পক্ষে হৃদয়ে ঘনায়।
শ্রান্তি নামে রাত্রিসম—আসে দূর কুয়াশা-তুহিন,
ফুটাও ভোরের আলো স্নিগ্ধ নীলিমায়।

৫

যে গান গাহিতে চাই অশ্রুমুখী সন্ধ্যার আলোকে,
মুক্ত তব কেশপাশ সে গীতি ভুলায়!
যে প্রেম-পরশ চাই, রাগরক্ত কিংশুক-অশোকে
যৌবন সঞ্চারে তারে দীপ্ত গরিমায়।

এ মোর দ্বাদশী, সখি,—ছন্দ-সুর সকলি মুকুল ;
মঞ্জরির সম্ভাবনা উঠিছে গুঞ্জরি।
যে মালা রচিয়া যাই, তাহে নাই যূথিকা-বকুল,
সুধা-স্মৃতি,—রাখে না সে আপনা সম্বরি।

ভালো যদি নাহি লাগে পূর্ণিমার প্রচুর সম্ভারে,
তাহারে ফেলিয়া যেও পথের ধূলায়।
আছে দীপ্ত রবিকর,—আছে মৃত্যু কাল-সিন্ধু-পারে
অমর পাথেয় মোর সে রুদ্র-লীলায়।

৬

এ তনু-বাঁশরি মোর ভরি নিত্য নব-নব গানে ;
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিয়া মূর্তি ধরে সুর।
চিবুক, ললাট, ওষ্ঠ ভঙ্গে-ভঙ্গে সুষমার ধ্যানে
গড়িছে তোমারি কায়া স্বপ্নভারাতুর।

আজিকে শিরায় মোর বহি যায় রুধির সুরার।
অধরের প্রান্তে চির চুম্বন-পিয়াস।
কায়া খুঁজে ফিরে গান, সুর চাহে তনুর আগার
তনুতীর্থা, মর্মে জাগে অসীম তিয়াস।

তুমি কি বাঁশরি মোর অথবা সে রাগিণী-নির্ঝর—
মন-বন-ছায়ে-ছায়ে ফিরো একাকিনী।
পরুষ-পুরুষ কাঁদে, কাঁদি ফিরে কুসুম-কেশর—
ভাবি তুমি নৃত্যশীলা চিত্ত-বিহারিণী!

৭

অস্ফুট স্মৃতির সুর ভাসি আসে বাতায়নে মোর
আনীল নয়নে তব স্বপ্ন জাগে তার।
কত না প্রভাত-সন্ধ্যা তারি স্নিগ্ধ সৌরভ-বিভোর—
কত মধ্যদিনে বাজে উদাসী সেতার।

তুমি এসেছিলে কবে লঘুপদে চটুল চঞ্চল
আতাম্র আম্রের বনে মুগ্ধা বাসন্তিকা—
কত সুর-শিহরণ, কত দূর—মূর্ছনা-উচ্ছল—
সদ্যস্ফুট বকুলের সুস্নিগ্ধ মালিকা।

আজিকে হেনার গন্ধে পথ-বায়ু হয়েছে উতল—
শুভ্র বনফুলে-ফুলে ছেয়েছে কানন—
তেমনি আসিবে সখি, দুটি আঁখি আনন্দ-উজ্জ্বল—
তেমনি ব্যাকুল হিয়া, মুগ্ধ আলিঙ্গন!

৮

দুটি আঁখি-তারা তোর—সে যে মোর ফাল্গুন-স্বপন!
চিত্ত আজি পূর্ণ মোর স্মরণ-সুধায়।
ব্যথায় আতুর বাণী ছন্দ ভরি করি আহরণ—
কল্পনা তোমারে ঘিরি গুঞ্জরিয়া গায়।

দুলে দেবদারু-কুঞ্জ ; ক্ষীণতম পাণ্ডু শশীলেখা।
কপোতকূজনক্ষান্ত ভবন-শিখর।
লুব্ধ মনে দেখা দেয় ফিরে তোরি ম্লান হাসিরেখা–
মিলন-কম্পিত ভীরু শুভ্র পয়োধর।

কি আনন্দ দিব তোরে? ত্রস্ত দুটি বাহুডোরে তাই
বাঁধিয়া রাখিতে চাও, শশী পড়ে ঢুলি—
আননে নয়ন রাখি মৃদুতানে গান গেয়ে যাই—
বিদায়-বেদনা তুলে অন্তর আকুলি!

৯

শীর্ণ শুভ্র পথরেখা গ্রামপ্রান্তে আম্রবীথি-সাথে
মিশে যায় ;—তৃণহীন ধূসর প্রান্তর।
উদাসীনা দক্ষিণার বীণা বাজে বাসন্তী-প্রভাতে
মুকুল-উৎসব শেষ। বিদায়-বাসর।

যতদূর আগে যাই, ব্যগ্র মন ফিরে ততোদূর।
ধূলিরুক্ষ পল্লিপথ তুলিছে অঙ্গুলি।
স্নিগ্ধশ্যাম বটচ্ছায়ে বাজে বাঁশি ক্লান্ত মেঠো সুর—
মনের রাগিণী উঠে কান্নারে আকুলি।

সে গান বাজিছে আজো রিক্তপত্র বেণুবন ঘিরে,
বেজে যায় রৌদ্রদগ্ধ ক্লান্ত নভতলে।
অন্তর-কম্পনে তোর সে গান কি বাজে সখি ধীরে-
রাগরক্ত হয়ে উঠে নেত্রশতদলে!

[মা ন স   বি র হ]

১০

আজো যারে পাই নাই, তারি লাগি কবিতা আমার
সংগীতের মতো ধীরে তুলিছে কম্পন!
এ পট-ভূমিকা মোর অপেক্ষিছে তারি তুলিকার
কোমল মধুর স্পর্শ,—যেন সে চুম্বন

প্রিয়ার অধরে ফুটি রচি দিবে স্বপ্ন-কিশলয়,—
হৃদয়-বেদনা-ভরে সদা কম্পশীল!

কেমন তুলনা তার!—আজো কবি ফিরে ধরাময়
আজো তার আঁখি ভরি নামিছে সলিল!

জীবনে হারানু যারে, স্বপ্ন মোর তারি লাগি ফিরে—
দেশ হতে দেশান্তরে স্মৃতি-ভারাতুর।
যে ছিলো, তাহারি লাগি কাঁদে মন অতীতের তীরে,
তাহারি সৌরভে মোর চিত্ত ভরপুর।

১১

অনাদি অতৃপ্তি তাই বক্ষে মোর বাঁধিয়াছে বাসা ;
করতলে আমলক,—উদাসীন মন!
কে যেন চঞ্চল পান্থ, নাহি জানি কি যে তার আশা,-
প্রশান্তির কারাগারে হারালো যৌবন!

যে-গান গাহিনু আজ, কালি তার সে সুর নাহি রে!
কোন্ ছবি আঁকো বসি হে উন্মাদ কবি!
কালের তরঙ্গ-ঘাত নিত্য লাগে স্থাণুর কুটিরে ;
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর চন্দ্র-তারা-রবি।

তবু গান গেয়ে যাই, হে উদ্দাম, আমি তব সাথী ;
অশ্রান্ত কল্লোল শুনি প্রাণ-সিন্ধু-তটে!
মুদি অবসন্ন আঁখি, কবে জানি ঘনাইবে রাতি—
বিদ্যুৎ-বল্লরি আঁকি আঁধারের পটে!

১২

জানি সে ক্ষণের শোভা, নয়নের চকিত বিস্ময়,—
দূরশ্রুত বাঁশরির অস্ফুট আলাপ!
তবু সেই স্বপ্ন মোর নহে শুধু অপার সংশয়,
নহে শুধু সোহিনীর করুণ বিলাপ!

আমি কি গো ছন্দে ধরি ভবিষ্যের ঐশ্বর্য অগাধ,
ছন্দে ধরি নীলিমার উদার বিলয়!
ছন্দে ধরি মানসের লীলাময় সংগীত অবাধ,
সুরে যার গলি যায় সহস্র হৃদয়!

হায় কবি, ভাসি যায় দূরে-দূরে সুরের লহর—
ব্যর্থ তুমি, আজ-ও কারে খুঁজিছ বৃথায়!
বেদনার অশ্রু দিয়া গড়িবে কি জীবন-প্রহর—
বক্ষের শোণিত দিয়া গড়িবে নিশায়?

১৩

তাই শুধু তারি তরে রচিলাম কবিতা আমার
হেরি নাই কভু যার আঁখির পল্লব।
আঁকিলাম অলক্তকে—হৃদয়ের, বুঝি কবিতার
মধুময় তনুতীর্থ, আলোক-সম্ভব।

ভ্রমর-গুঞ্জনে সে কি বলেছিলো কভু নিশাশেষে,
ভালোবেসে ওগো কবি, আঁকিয়ো অঞ্জন!
ললাটিকা আঁকি দিও চূর্ণ-চূর্ণ গুচ্ছ মধ্য-কেশে,
লাজ-স্বেদে ভরে যবে আমারি আনন।

ঘুমের জড়িমা ছিলো ; শুনি নাই সেই বাণী তার
স্তব্ধ কবে সেই সুর, আসে না স্মরণে।
যারে কভু হেরি নাই, হারায়েছি স্মৃতি-সুধা যার,
কেমনে রাখিব তারে বিস্মৃতি-মরণে।

১৪

আজি আসিও না কাছে,—জ্যোৎস্নাময়ী মধুর যামিনী
আমি ছাদে বসি রব নিঃসঙ্গ উদাসী।
আবরিয়া শুভ্র তনু শ্বেতবাসে চলো একাকিনী,
কুয়াশার কালো মুখে ফুটাইয়া হাসি।

তোমার চরণে পদ্ম, কেশপাশে ম্লান হল নিশা--
চাঁদ ঢাকে মুখ তার মেঘের গুণ্ঠনে ;
তবু আজি দূরে-দূরে কবি তব হারায়েছে দিশা।
আজিকার গান হবে স্বপনে-ক্রন্দনে।

আজি আসিও না কাছে, কপোত কাঁদিয়া যাবে ফিরে,
গঙ্গাতীরে নিঃশ্বসিবে কৃষ্ণ তট-ঝাউ!
নারিকেল-পাতাগুলি মৃদু বায়ে মর্মরিবে ধীরে ;
ধূসর কুহেলিসম সুদূরে মিলাও!

১৫

হে দূর, তোমারি স্বপ্নে মগ্ন আজি কবি-মন মোর ;
হেরেছিনু একদিন সোনালি উষায়,
তোমার উত্তরী-প্রান্ত, আঁখিদুটি রঙিন, বিভোর,
হেরেছিনু মেঘ-কেশ অশেষ ভূষায়।

ধূসর কাশের বনে আজো তোমা হেরিলাম চাহি!
মন্ত্র তব জপি বসি অন্তরে-অন্তরে।

উত্তরীয় করো মোরে,—অগাধ অনিলে অবগাহি!
শেহলা হব না ; তাই এ চিত সন্তরে।

ক্ষীণ হয়ে এল গান, উত্তরীয় করো বন্ধু মোরে!
উড়ে যাই ধীরে-ধীরে বিস্মৃতি-তিমিরে।
অবসান, অবসান—গুঞ্জরিব শান্ত ঘুম-ঘোরে,
নিঃশ্বাস-সৌরভে বুক আন্দোলিবে ধীরে।

১৬

আবার আসিবে তুমি মর্মরিত বেণুবনতলে—
বসন্তের শিশুস্বপ্নে কোলে তুলি লবে ;
মেঘালোক ভাষাময়,—প্রাণনাশী রুদ্ধ কল-কলে
সঞ্চারিবে স্রোতোবেগ প্রদীপ্ত গৌরবে!

সুদূর উত্তরমুখে ঘনভার ছড়ায় অলক—
তুমি এসো বনপথে বিলোল-কুন্তলা,
নিতম্ব-বিসারী কেশ—পড়িবে না আঁখির পলক ;—
গোপন যৌবন-ছন্দে হিল্লোল-চঞ্চলা!

সরসীর শীত-নীরে স্মিতাননে, রচিবে মুকুর—
পথ-ভরা ছায়া তোরে করিবে উন্মনা ;
বন-কপোতের সুরে গাবে গান উদাসী দুপুর—
সেথা তুমি প্রাণময়ী মুরতি কল্পনা!

১৭

যেথা সদা প্রাণ-ভীতি, উদাসীন কাঁদিছে যেথায়,
বাজে কি নূপুর সেথা স্বপন-সম্ভবা?
দোলে কি হৃদয় মোর সুখালস-নিমীল তন্দ্রায়?
কোথা বায়ু?—লতা যেথা বিচ্যুত-পল্লবা!

বহে ঝড়—ভীমবেগে কাঁপি উঠে বিশুষ্ক বিতান ;
ভূমে ঝরি পড়ি যায় বিশীর্ণ বল্লরী!
আমি সখি, সেই ঝড়—মেঘে-মেঘে বিক্ষুব্ধ বিমান--
তুমি পড়ে আছ ভূমে—সম্মুখে শর্বরী!

আবার আসিবে তুমি ধীরে মোর বৈশাখী হিয়ায়
পুবালি মেঘের মতো বর্ষণ-মুখর—
নিদাঘ-দহন-ভীত তরু-শির সে যে চুমি যায়—
আসিবে তেমনি—প্রাণ পরশ-কাতর!

১৮

মনে পড়ে বহুবার অর্ধচ্ছায় প্রদীপ-আলোকে,
রাঙায়েছি সিঁথি তোর গোধূলি-সিন্দূরে!
কিশোরী-ললাট ভরি আরক্তিম আশার ঝলকে,
হেরেছি কপোল-প্রভা, বেদনা-বিধুরে!

আম্র-তালী-পনসের বন-বীথি—মাঝে পথখানি—
কিশোর পরিল গলে কুসুম-মালিকা—
করে নিল করতল—বুক ফাটে নাহি ফুটে বাণী—
সচন্দন পুষ্প-থালে নব শেফালিকা!

জাগিছে প্রহরা শুধু—আঁখি যেন চুরি করে চায় ;—
সজাগ অন্তর শোনে বধূর নূপুর—
কঙ্কণ-নিক্কণ শুনি—সে রহস্য কোথায়-কোথায়?
সোনার প্রতিমা যেন ভেঙে চুর-চুর!

১৯

মাটিতে ভরিয়া মুঠি বিন্দু-বিন্দু মর্ম-সুধা দিয়া,
বিচিত্র স্মৃতির রঙে বিরচি প্রতিমা ;—
পাষাণ-অন্তর হতে গতি-রস আসে বাহিরিয়া
গঙ্গার প্রবাহ যাহে দিতে নারে সীমা—

পড়ে যেন রবি-রশ্মি কুয়াশার অস্পষ্ট মন্দিরে—
সে স্বপন-সৌধ-শির মাটিতে লুটায়!
দৃষ্টি-লোপী অন্ধকার নেত্রপ্রান্তে নামে ধীরে-ধীরে—
সর্বগ্রাসী কল-কল বালুকা-বেলায়!

সে নিশার তৃষা-শেষে দেখা দিবে চকিতা বিজলি,
নয়নে অদ্ভুত হাসি, অঞ্চলে কৌমুদী—
ফুল্ল মল্লিকার ঘ্রাণে নেত্র হতে নিদ্রা যাবে চলি ;—
যাবে না নেশার ঘোর, রব আঁখি মুদি!

২০

আজো বসি তমিস্রায় বিস্মৃতির সে মণি-কুট্টিমে,
মনে হয় জ্বলে আলো মুমূর্ষু ক্ষীণায়—
করতলে তুলি মুখ ম্লানালোকে হে অপরিসীমে,
বিস্ময়-বিকল মন ;—বহে পূর্ব-বায়ু—

বহে বন-মধু লুঠি, পড়ে আসি অলকে তোমার ;—
কেশপাশে ঘুরে মরে রুদ্ধ অসহায়!

প্রদীপ নিবিয়া যায়—সরে দূরে স্রস্ত কেশভার ;
মনে ভাবি সে স্বপন কোথায়-কোথায়!

কোথা সে আবেগ তীব্র, সিন্ধুসম উত্তাল অধীর
সুমধুর গীত-সুর কঙ্কণ-ঝঙ্কারে—
কোথা সেই মোহ-ঘোর—ভ্রান্তি কোথা শুক্লা যামিনীর
কোথা সেই গন্ধবহ কুসুম-আগারে?

২১

মনে পড়ে মেঘচ্ছায়া,—ক্লান্ত চক্ষু চাহি তার পানে ;—
কে বুলাতো শীতস্পর্শ এ নয়নে মোর—
দুঃসহ দাহনে প্রাণ ভরিত না সমীরের গানে—
শিহরি উঠিত সে যে কলহাস্যে তোর!

সে হাসি-চমকে প্রাণ কুহরিত সহস্র ভাষায়
সে ভাষা পাই না খুঁজি অক্ষরে-অক্ষরে ;
ব্যাকুল বিহগী যথা গাহে গান অরণ্য-সভায়—
বিহগ শোনে না সুর উদাস প্রান্তরে!

মনের বিহগ মোর ঝঞ্ঝাবাতে উড়িছে সুদূরে
মনের বিহগী তোর আজি একাকিনী—
আছে কি নীড়ের মায়া?—তাই বুঝি ক্লান্ত ক্লিষ্ট সুরে
ডাকিছ সখারে হায়—কেন এ কাহিনী!

২২

জানি দীর্ঘ বনস্পতি মেলি ঘন শ্যামল পল্লব,
শূন্য-ভরা রৌদ্রদাহে সদা ঊর্ধ্বশির!
পুষ্পিত লতার প্রেমে তবু তার বাড়িছে গৌরব
দৃঢ়মূল বীরপুত্র মাতা ধরিত্রীর—

সে কি কভু জানে সখি, মরমের দুঃসহ দাহন—
মানবের অনশ্বর মানস-গতিরে?
মৃত্যু-নীল সরোবরে করে যেই সতত গাহন
জানে সে কি সেই নর-প্রাণের বাণীরে!

মাটিরে করিয়া ভর, প্রাণ যার ছুটিছে উধাও
যুগ হতে যুগান্তরে গান যার জয়ী!
লতাসম স্নিগ্ধ বাহু তার গলে কেন তুলি দাও
ফুলহার ভার হয় জানো মায়াময়ী!

২৩

আছে নীড়,—আছে ক্ষীর, আছে কোটি মাটির সন্তান-
আর নব-নব ছায়া পারি না ধরিতে!
আজি মোরে মুক্তি দাও, মেঘে-মেঘে করিব সন্ধান
ক্ষীণায়ু প্রদীপসম চাহি না মরিতে।

বেতস-লতার মতো স্রোতোমুখে সদা কম্প-শীল—
জীবন-বন্ধনে সখি, ব্যাকুল অধীর ;
আনো দৃপ্ত পরমায়ু, আনো প্রেম সুখদ সলীল—
আনো-আনো অবসর ভরি দুটি তীর।

আনো সেই কম-কান্তি মর্ত্যলোকে দেবতা-দুর্লভ,
নবনী-নিন্দিত-তনু মনোজ-মোহন,
মেঘসম কেশভার—ঘন-কৃষ্ণ আঁখির পল্লব,
স্নেহসার-স্থিত মন সহজ শোভন!

২৪

সে তনু মিশায়ে গেছে আজি মোর শিরায় শোণিতে ;
নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে মোর শুনি সে স্পন্দন!
সেই শ্লথ মুক্ত কেশ, সে চুম্বন আছে ধমনীতে—
নবীন মুরতি তার করিনু অঙ্কন!

শত-শত যামিনীর জাগরণ-অরুণ-নয়ন—
নব-নব রজনীর অতিথির লাগি,
কোটি-কোটি মুখ-বিধু-সীধু-সুধা করি আহরণ—
একমুখে ছায়া তার রহিল রে জাগি!

একমুখে রহি গেল ভবিষ্যের উষার আভাস,
এক তনু-বাঁশরির নবীন সংগীত,
পরিপূর্ণ পয়োধর-শিহরিত কোমল নিঃশ্বাস—
এক দেহে ঝঙ্কারিবে সহস্র নিশীথ।

২৫

যবে রাত্রি হবে শেষ,—কৃষ্ণ তার সে দুটি নয়নে
নিগূঢ় আনন্দ-জ্যোতি হেরিব মধুর!
বর্ষণ-মুখর নিশা, দিশাহারা কল্পনা-চয়নে—
গুঞ্জরিবে কত গীতি অধরে বধূর।

সে তনু-বল্লরী ঘেরি পূর্বরাগ-পল্লব মুঞ্জরে ;
কত দীর্ঘ দিবা-স্বপ্ন রঞ্জিবে কপোল,—

বিস্মৃত যামিনী-পারে প্রাণে মোর কি গীতি সঞ্চরে—
    ললাট পরশে কার সুরভি নিচোল!

অপূর্ব অলক-গন্ধে তৃষাতুর কাঁদিছে ভ্রমর—
    তোমারে সৃজিনু আমি পড়ে না তো মনে!
সর্ব তৃপ্তি-অতৃপ্তির মাঝে জাগে রহস্য অমর—
    সে মায়া তোমারি জানি কমল-আননে!

২৬

গাঢ় করো মেখাঞ্জন, আনো ছায়া সন্তাপহারিণী,
    মদির আয়তনেত্রে বিভ্রম-প্রলয়!
আনো সেই মোহাবেশ,—মূর্ছে যাহে অযুত রাগিণী,—
    অযুত তরঙ্গশীর্ষ যাহে পায় লয়।

ক্ষীণশক্তি লতা তুমি?—এ কথা যে পারি না ভাবিতে—
    গড়ি তাই নব মূর্তি মানস-সঙ্গিনী!
তবু তার দেহ ভরি, তার মধু অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে
    তব রূপ, করে তার তোমারি কিঙ্কিণী!

সর্ব দেহে ক্ষরে তার অবিমিশ্র স্মরণের সুধা—
    আমি যে রাঘব সখি, বিরহবিলীন!—
প্রতিমার পদতলে বিসর্জিনু আসিন্ধু বসুধা—
    অসহায় চিত্তে ঘুরে বাল্মীকি-বিপিন!

২৭

বসে আছ উদাসিনি, করতলে রাখিয়া কপোল,
    বিলোল অলকে আলো বিছাইছে মায়া—
হৃদয়-জলধি শান্ত, তাই বুঝি আপনা নিভোল
    আছ দ্বারপ্রান্তে বসি শরীরিণী ছায়া!

স্তব্ধ মেঘ, স্তব্ধ বায়ু—মন কভু স্তব্ধ হয়ে রহে?
    প্রশান্তি-বিলীনা—তবু চলে আলোড়ন ;
কবে দেখা দিবে ঝড় ছিন্ন করি মানস-বিরহে—
    উন্মাদ হৃদয়-সিন্ধু করিবে গর্জন!

তখনো পাবে না প্রাণ আত্মস্থিতা নবীনা মুরতি?
    দেহ-ভরা লাবণ্যের পাব না সন্ধান?
ভস্ম হোক মনসিজ—তবু তুমি দেখা দিবে রতি —
    শোকময়ী তনু-দেহে হিল্লোলিবে প্রাণ!

জলাঙ্গী*

চলেছি একাকী পথে অন্যমনে ভাবনা-বিলাসী ;
কৃষ্ণচূড়াবীথি হতে বসন্তের আলঘু নিঃশ্বাস
সমীরিত রৌদ্রদাহে ;—ধরণীর নব প্রেমোচ্ছ্বাস
নূতন করিয়া কহে—ভালোবাসি শুধু ভালোবাসি।
ভাবিলাম, এই গতি, ভুলে-যাওয়া আর ভালোবাসা-
এই শুধু অনন্ত জীবন ; দুর্বল স্মরণ-তরী
ভাসায়েছি কাল-স্রোতে সখী সেই অসীম পিপাসা।
সহসা চিন্তার জাল দীর্ণ করি উঠিল মর্মরি
জলাঙ্গী, তোমারি প্রেম, তব স্বচ্ছ জলময়ী ভাষা—
কীর্তি-নির্বাপণ-গান কর্ণে মোর উঠিল গুঞ্জরি।

মনে হল ফিরে যাই তব তীরে কিশোরের বেশে—
কালের অঙ্কনহীন সুকুমার প্রসন্ন ললাট,
নিঃশঙ্ক স্বচ্ছন্দগতি—আশা আর হাসির সম্রাট,—
স্মৃতির উজান ঠেলি ফিরে যাই বিস্মৃতির দেশে!
সবুজ মটর-ক্ষেত, তারি নিচে শুভ্র বালুচর,
শেহনা দুলায়ে মাথা শান্ত স্রোতে সাথী হতে চায়!
ছোট-ছোট জেলে-ডিঙি—বারোমাস জলের উপর
উন্মুক্ত জীবন-যাত্রা—ওপারের তটের রেখায়
ঘন নীল আকাশের ছায়া—তারপরে শ্যামস্তর
শিহরিয়া উঠে শুধু শালিকের পাখায়-পাখায়।

তব প্রেম স্বপ্ন মোর, হে জলাঙ্গী, সলিল শোভনা.
ভুলেছি কত যে নাম, তব নাম পরিনি ভুলিতে!
ফিরিব না কভু আর, আজি তাই অয়ি শুচিস্মিতে,
তব নাম-সূত্র ধরি ঘুরে মরে আকুল কামনা।

জলাঙ্গী কৃষ্ণনগরের প্রান্তবাহিনী নদী।

হয় তো বা দেখা হবে ব্রিজ হতে ক্ষণকাল তরে
চাঁদের পাণ্ডুর আলো তব স্রোতে উঠিবে ঝলসি।
কত নাম, কত মুখ হৃদয়ে আসিবে ভিড় করে
কত অসমাপ্ত গান দীর্ঘশ্বাসে উঠিবে উচ্ছ্বাসি!
চিনিবে বন্ধুরে তব? বলো-বলো তারার অক্ষরে
বক্ষে তব কার নাম?—সাক্ষী যার তন্দ্রাহীন শশী!

দেখিলাম শ্যামা মেয়ে প্রান্তরের বটতরুমূলে
শিথিল করবী-বন্ধ ; গুচ্ছ দুই শুভ্র ভাঁট ফুলে
রচিয়া সীমন্ত-শোভা, তরঙ্গিত সুদীঘ অঞ্চল
প্রসারিয়া চৈত্র-রৌদ্রে একাকিনী শান্ত অচপল
চেয়ে আছে দূর শূন্যপানে। মেঘ-সম নীল শাড়ি
আলিঙ্গিয়া সর্বতনু চলে গেছে দেহসীমা ছাড়ি
দিগন্তে স্বপ্নের মতো—শস্যহীন ক্ষুধাতুর দেশ,
ক্লান্তকণ্ঠে ডাকে ঘুঘু, নেত্রে নামে তন্দ্রার আবেশ!
তরুচ্ছায়াতলে আসি মনে হল চিনি যেন তারে,
তাহার মুখের রেখা জন্ম-জন্মান্তের অন্ধকারে
অর্ধ-বিস্মৃতির দীপে উদ্ভাসিয়া উঠিল হৃদয়ে—
স্নেহস্বরে সম্ভাষিয়া কহিলাম, 'অয়ি অবিস্ময়ে,
ভুলেছি তোমার নাম—বহুদূর আসিয়াছি চলি!'
'জলাঙ্গী—গঙ্গার সখী'—স্নিগ্ধহাস্যে কহিল শ্যামলী।

সহসা পড়িল মনে, পুরাতন-পরিচয়-পথে
একটি মালার মতো দিনগুলি গাঁথা এর-স্রোতে।
এর জল-কলধ্বনি, শ্রাবণের ঘন সমারোহ,
উদয় অস্তের লীলা, দিনান্তের সন্ধ্যারাগমোহ,
আমার কাব্যের মাঝে এর লঘু গোপন সঞ্চার
প্রথম করিনু অনুভব। হৃদয়ের গুরুভার
দূরে গেল, কহিলাম, 'চিনিয়াছি হে শ্যামলী মেয়ে,
কিশোর-স্বপ্নের সাথী, কতদিন মৃদুগান গেয়ে
ফিরেছি তোমার পাশে। তুমি ছিলে অদূরবর্তিনী
তটপ্রান্তলীনদেহা। বহুদূর-দিগন্ত-সঙ্গিনী—
ঋতুর বিস্ময়ঘেরা মূর্ত স্বপ্নসম ছায়াময়ী ;
আজ দেখি নদী নহ, নারী তুমি কবি-চিত্ত-মোহি
বসে আছ একাকিনী প্রান্তরের পথতরুমূলে!
শুনিছ কি সেই বাঁশি বাজিত যা তব কূলে-কূলে?

'বঙ্গের যমুনা তুমি মেঘকৃষ্ণা অয়ি অপরূপে,—
বৈষ্ণবী রসের ধারা সুরভিত অনুরাগ-ধূপে।
তব ঘন কালো জলে পলে-পলে লহরে-লহরে
আত্মবিসর্জনী গান বাজিতেছে তরলিত স্বরে
উদার বঙ্গের মাঠে। শুনি গৌড়—সারঙের সুরে
অপূর্ব-সন্ন্যাস-কথা—সে কাহিনী আসে ঘুরে-ঘুরে
স্বপ্নশেষ শতাব্দীর রূঢ় রৌদ্রে, অয়ি উদাসিনী!
তুমি তো জানো না নিজে উঠিছে কি বিস্মৃত রাগিণী
অবিশ্রাম গতির ভঙ্গিতে!' জলাঙ্গী উঠিল হাসি—
মল্লিকা-বকুল-কুন্দ শুভ্র ফুল যেন রাশি-রাশি
নিঃশব্দে ঝরিয়া গেল—'সে কাহিনী পড়ে না তো মনে,
আমার নূতন জন্ম, নব স্রোত, নূতন প্লাবনে
সে স্মৃতি ফেলেছি দূরে ; নারী নহি ;—নিত্যগতিশীলা
কালস্রোতে ছুটে চলি—ভুলে যাই—এই মোর লীলা।'

'হে নদী, দেখেছি আমি মানবীর মহূর্ত-বিলাস ;
সে-ও তো তোমারি মতো ভুলে যায় স্নিগ্ধ অবকাশ!
কত কাব্য, কত গান বৃথা রচে চরণ-শৃঙ্খল!
গতির গভীর বেগে বিচ্ছেদের ধ্বনি অবিরল
বাজিছে গম্ভীর মন্ত্রে! একরূপ—নদী আর নারী
নিশিদিন চেয়ে আছি—সে রহস্য বুঝিতে না পারি,
বেগস্থির জলদেহ, তলহীন পরিণামহীন—
অজ্ঞাত ইঙ্গিতে ছুটে, চেয়ে আছি মুগ্ধ নিশিদিন!'
দিন শেষ হয়ে এল ; শৈবালের ঘন গন্ধ-সনে
আসন্ন গোধূলি—ছায়া ; মোহমন্ত্র পশিল শ্রবণে:
কম্পমান পল্লবের প্রান্তচ্ছেদ দেখিলাম চেয়ে
অস্ফুট ছায়ার মতো নেমে গেল শ্যামলী সে মেয়ে,—
মিশে গেল নীল জলে ; স্রোতোবেগ উঠিল উচ্ছলি—
'আপনারে ভালোবাসি—নদী আমি!'—কহিল শ্যামলী!

'ফিরিব না কভু আর'—বলেছিনু একদা উন্মনা
ভাবমূঢ় চেতনায় হেরিছিনু অস্পষ্ট সেথা ফিরিব না—
আমারি জীবন-কথা। ওর তীরে আর
অরুণ সিন্দূর তব সীমাহীন সীমন্ত-রেখায়
দেখিব না তব কবি হে জলাঙ্গী, গোধূলি আঁধারে
তারকা আসিবে খসি সন্ধ্যাস্নানে তব জলতলে
সুনির্জন বনভূমে তীব্র দীর্ঘ করুণ চিৎকারে

কাঁদিবে ঝিল্লির দল—শিশিরাশ্রু নবীন শাদ্বলে
শেভিবে মুসার মতো—দূরতম স্রোতের কিনারে
ভাসিবে নিঃসঙ্গ ভরা, ফিরিবে না উদয়-অস্তে!

ওগো নিত্যগতিময়ী, তুমি জানো তব পরিণাম
তাই তো যৌবন তব উচ্ছ্বসিত এক লক্ষ্য-পানে
আনন্দের সৌন্দর্য-পসরা। আর যার নাহি গান,
আর যার যৌবনের নিষ্পেষণ জীবন-তুফানে
মৌন তার যন্ত্রণায় কোথা গতি কোথা বা উদ্দেশ
হে জলাঙ্গী, পারো কি বলিতে? তুমি ধ্রুব মহিমায়
সলিল-মুকুরে তব হেরিতেছ উল্লসিত বেশ
বক্ষ তব দুলে উঠে আকাশের সূচীন ছায়ায়
দুর্বার যৌবন তব উপেক্ষিত কালের নিমেষ,
কি কঠিন পর-ভাগ্য, জানো তোর সন্ধান কোথায়?

শ্যামলী, তুমি তো ভাঙো, ক্ষুরধার তরঙ্গে তোমার
মৃত্তিকার গূঢ়গ্রন্থি ছিন্ন করা বিজয়-উল্লাস,
সে তব সংহার-মূর্তি, সৃষ্টি ***
হিল্লোলিত কাশগুচ্ছ মিশে যায় সুদূর আকাশে।
হে সুন্দরা, দৃষ্টি মোর বিনাশের করে না সন্ধান
কোথা আদি, অন্ত তার—দেখি শুধু নিঃশব্দ ভাঙন
এ নদীর প্রান্ত হতে শুনে শুধু বাজিছে বিষাণ,
প্রলয়-ডম্বরু-রোল। অবিরাম জমিছে শ্রাবণ
মিশে যায় তটরেখা, কণ্ঠে আসি থেমে যায় গান
ফিরিব না কভু আর—ঝিল্লিরবে কাঁদিবে কানন।

(বঙ্গশ্রী, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৩৪)

দীর্ঘনিঃশ্বাস

বাঁশির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গান
সময়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিপূর্ণ করি আমার সৃষ্টি
ক্লান্তিহীন কর্মের উত্তাপে।
দুর্ভাবনার মন্থর জড়ত্বকে জয় করি
এমনি দুরাশা।
চেয়ে দেখি আমগাছের রৌদ্রছায়ায়
মাকড়সা তার তন্তুজাল বয়ন করে—

রাত্রির শিশির এসে পড়েছে তার উপর
আর পড়েছে শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র।
চেয়ে দেখি শালিকপাখির অক্লান্ত পদচারণা
আর শুনি অগণন মুহূর্তের নিঃশব্দ পদক্ষেপ
ক্ষুধার্ত পিঁপড়ের সারির মতো
একটি অকারণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

(কবিতা, ১৮.৯.৩৬)

"স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু"

প্রতিরাত্রে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা—
বহুবল্লভ দুষ্মন্তের শুদ্ধান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চলে যাই কালিদাসের কালে
যখন নদীকান্তার নগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ
কবির কাব্য যখন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদনখের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর—
স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই।
আর গান শুনি হংসপদিকার—
রাজ-উপবনে বিরহিণী নারীর মৃদু গুঞ্জরন
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

প্রতিরাত্রে আমি আমার প্রিয়তমার গান শুনি
প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়তমা—
গৃহবাতায়ন-পার্শ্ববর্তিনী কল্যাণী বধূ।
স্বপ্নে আমি নেমে আসি আধুনিকের কালে
যখন পীড়াজর্জর ত্রস্ত জীবনে অবসর দুর্লভ,
কবির কাব্যে যখন আর প্রিয়া নেই
প্রিয়ার পদনখ যখন আর সম্মানিত হয় না কবির বাক্যে
বিচিত্র সুন্দর উপমায় আর অলঙ্কারে
তখন আমি গান শুনি ভীত দাসজীবনের গান
কঙ্কর আর তপ্ত মরুবালুকায়
দুঃখিনী প্রিয়তমার মুখের রেখা অঙ্কন করি
মনে হয়, এ বিরহ, না মিলন, না মৃত্যু!

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

বর্ষারাত্রির অন্ধকারে

বর্ষারাত্রির সঘন ঝিল্লিরণিত অন্ধকারে
অনেকদিন আগেকার হারানো কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে একটি তন্দ্রাজড়িত নিবিড় মিলন প্রতীক্ষা
বাইরের সীমাহীন নির্জনতায় দুটি প্রাণীর
দুর্লভ মনোবিনিময়ের অবসর—
আজ বর্ষারাত্রির সব কিছুকে ছাপিয়ে
সেই সুন্দর মুহূর্তগুলির অনেকদিনের
ওপার থেকে মনের মধ্যে জেগে উঠছে।
মনে হয়, যা হারিয়ে যায়, তাকে
পাওয়ার মতো আনন্দ আর কি?
জীবনের সান্দ্র বিরহনিশার মধ্যে এই চকিত বিদ্যুৎদীপ্তি
একটি সার্থক মিলন-অনুভূতি ঘনিয়ে আনে।

(প্রবাসী ১৩৪৩)

প্রভাত-পদ্ম

ফুটিছে প্রভাত-পদ্ম চেতনার সাগর-সীমায়
মৃত্যুঞ্জয়ী পদ্ম সেই—মুগ্ধ চোখে দেখিতেছে চেয়ে
প্রবাহিয়া চলিয়াছে জীবস্রোত বেলা-বালুকায়
লঙ্ঘিয়া জীবন-মৃত্যু দুর্নিবার ব্যবধান বেয়ে
মরণ-রাত্রির পারে জ্যোতির্ময়ী সুন্দরী উষায়
মনে হয় উড়ে যাই বিহগের মতো গান গেয়ে
পার হবে মেঘলোক, প্রাণ ভরি দিব্য কল্পনায়
মৃত্তিকার গন্ধ লয়ে পক্ষ দিয়ে উড়ে যাই ধেয়ে।

আবর্তিত সুখ-দুঃখ রচিতেছে মর্ত্য ইতিহাস
আপন ভুবন রবে নির্বিরোধ ভাব-স্থির করি
সে ভুবন রাত্রির শেষ হল দূর দুঃসহ বিরহ।
কবিরে চিনিছে জানি, পেয়ে-নীল নির্মল আকাশ—
কবিরে চিনিছে জানি মূর্তিমতী-বেদনা ভৈরবী
ফুটিছে প্রভাত-পদ্ম প্রাণে তারি সুর অহরহ।

(প্রবাসী ১৩৪৩)

সীমাহীন এই প্রেম

আমি আছি-এই সত্য প্রথম করিনু অনুভব
দিবা আর রজনীর সংখ্যাহীন প্রতিটি নিমেষে
শব্দহীন কালের প্রবাহে। আনন্দ উদ্বেল প্রাণ
যখন স্মরণ করি প্রিয়া আছে নিভৃত কুটিরে
যখনি স্মরণ করি লুপ্ত হয় বিরহ-ভাবনা
—সীমাহীন এই প্রেম, প্রণতি জানাই বারবার।

মরদেহে লভিলাম জন্ম আর মৃত্যুর আস্বাদ
মরণেত্রে হেরিলাম জ্যোতিষ্কলোকের আবর্তন
শুনিলাম ছন্দোময় জীবনের প্রলয়-ঝঙ্কার,
প্রেমহীন জীবাত্মার অব্যক্ত আকুল দীর্ঘশ্বাস
প্রেমহীন জীবনের দেখিলাম ভয়ার্ত শূন্যতা
কোটি জন্ম-জন্মান্তের প্রেতস্পর্শ লভিনু নীরবে।
এমনি খসিয়া গেল কালস্রোতে পাঁচটি বছর
দুঃখের নখর-ক্ষত আজি চাই একান্ত ভুলিতে
মনে হয় ক্লান্ত বড়—যদি তুমি আসিতে এখানে
আমার কল্পনাসম লঘুপদে নিঃশব্দ সঞ্চারে
অদৃশ্যচারিণী লক্ষ্মী—রচিতাম কল্পনা তোমার
পৃথিবীর কবিদল স্তব্ধ হয়ে যেত একেবারে।

(প্রবাসী ১৩৪৪)

যৌবন ভিক্ষা

(অকালযৌবন)

যযাতি। দেবযানী, অভিমানী তুমি—অনন্ত তোমার প্রেম
অনন্ত আক্রোশ আর অনন্ত বিদ্বেষ! হে সম্রাজ্ঞী,
চাহিলে না রানীর সম্মান, পতি-পুত্রে বিসর্জিয়া
তপোবনে করিলে প্রয়াণ। ক্ষমা করিলে না তুমি-
ঋষি-কন্যা, ক্ষমা শেখো নাই। হে বহ্নি-রূপিণী,
একচ্ছত্র অধিকার চেয়েছিলে যযাতির গৃহে
যযাতির হৃদয়ের গূঢ় ক্ষুধা পারোনি বুঝিতে।
কোন্ দেবকুমারের তপোবদ্ধ প্রথম যৌবন

জ্বলন্ত সূর্যের মতো উদ্ভাসিল তব চিত্তাকাশে—
তোমার কুমারী-চিত্তাকাশে! সে তব প্রথম প্রেম।
মেলিয়া সহস্রদল তারি পানে অয়ি সূর্যমুখী
সপ্তবর্ণরশ্মিরাগ নিঃশেষে করেছ তুমি পান,
পূর্ণ তব হৃদয়ের একপ্রান্তে প্রৌঢ় যযাতিরে
সমর্পিলে কৃপার আসন। তুমি তো জান না রানী,
রাজতৃষ্ণা কারে বলে, কারে বলে রাজার পিপাসা!
আমি জানি দ্বন্দ্ব তব, আর জানি কামনা আমার—
সুর-কুমারীর কৃপা অসঙ্কোচে দিয়েছি সরায়ে
তাই মোর চিত্তে জাগে পূর্ণস্তনী অসুর-রমণী।
চেয়ে আছি নির্নিমেষ সেই তন্বী-দেহ-রহস্যের
ছায়াময় জালায়ন-স্তনে। যযাতি ভিক্ষুক নহে—

যদু। পিতা, মোরে করেছ আহ্বান?

যযাতি। হায় পুত্র, মাতা তব অসুর-গুরুর তপোবনে
হেলাভরে করি ত্যাগ সম্রাজ্ঞীর পূর্ণ স্বাধিকার
জটা আর বল্কলের দীনতায় গেছেন ফিরিয়া।
হের বৎস ঋষি-রোষে আজি মোর ললাটের রেখা,
হের রে কপোল অকাল-কুঞ্চিত—শিরে শুভ্রকেশ
অকাল-শিশিরে যেন ধরণীর যৌবন-আবেশ
নিঃশেষে হয়েছে লয়। বৎস মোর মূঢ় চিত্ত-তলে
অবিশ্রাম সঞ্চারিছে অশরীরী অধির কঙ্কাল
শীর্ণ বাহু তুলি তারা প্রতিক্ষণে করিছে সঙ্কেত
হিম-শীত মৃত্যু-গুহাপানে। তাই ডাকিয়াছি তোরে,
তুমি মোর জ্যেষ্ঠপুত্র, তোমা 'পরে উত্তরাধিকার,
অসপত্ন রাজ্যভার সমর্পিয়া মুদিব নয়ন,
এই অভিপ্রায় বৎস। তার আগে পুত্র-প্রিয়তম,
ভোগময়ী ধরিত্রীর উল্লসিত প্রতিটি নিমেষ
যৌবন-উদ্দীপ্ত নেত্রে হেরিবারে আছে বড় সাধ।
তোমার বিস্তীর্ণ রথো যে সমুদ্র পড়িছে মূছিয়া
আকর্ণ নয়নে তব নিশিদিন যে মোহ-বিস্ফব
কমনীয় চারু-কণ্ঠে অবিরাম যে সুধা-নিঃস্বন,
সে যৌবন, সেই মোহ, সে সংগীত মোরে দাও আজ-
আর বৎস নিতে হবে জীর্ণ জরা সহস্র-বর্ষের
এই মোর ভিক্ষা প্রিয়তম!

যদু। পিতা, তব কণ্ঠস্বরে তপোবৃদ্ধ শুভ্র হিমালয়
গলিয়া ঝরিছে যেন মোর চিত্ত-সাগরের তলে।
যেন আমি চলে গেছি বহুদূর জন্মপরপারে,
তোমার যৌবন-দেশে, কামনার প্রথম উন্মেষে,
অরণ্যের গাঢ় সুপ্তিমাঝে। সেথা তুমি পিতা মোর—
আর আমি সন্তান তোমার—তোমার আত্মার রূপ,
যে রূপে একদা তুমি হেরেছিলে অসহায় নারী
নিকুঞ্জ-গুহার মাঝে অসম্বৃতা অশ্রু ম্লানমুখী
আসে তাঁরি প্রথম সন্তান। আজ আমি হেরিতেছি
সেই ছায়া-অরণ্যের রাগরক্ত অশোক কুসুম,
স্বর্গ আর মর্ত্যতলে যত সুধা হয়েছে উদ্বেল
তাহারি পুঞ্জিত যেন মোর তরে হতেছে সঞ্চিত
সঙ্গোপানে নারী চিত্ততলে তাই মোর কণ্ঠস্বরে
শুনিতেছ অপার্থিব গান, মোর সখা হেরিতেছ
সীমাহীন সাগর মূর্চ্ছনা, নেত্রে মোহ-নীলাঞ্জন
করিতেছ আজি অনুভব। আমার যৌবন-দিনে
একি ভিক্ষা শুনিলাম তব কণ্ঠস্বরে? পিতা মোর,
কৃপা করো, শেষ হবে প্রজ্বলন্ত পিপাসা অনল,
তারপরে আছে মৃত্যু, আছে জরা যৌবন-নাশন
তারা সবে জীবনের স্তরে-স্তরে আছে প্রতীক্ষায়।
তারা তো শোনে না পিতা, করুণার আর্ত স্নেহস্বর!
তারা শুধু আসে যায় বর্ষা শীত হেমন্তের মতো
নর আর নারীদেহে বিকশিয়া কুসুম-স্তবক,
চূর্ণ-চূর্ণ করি শেষে ধূলিতলে ফেলি চলে যায়।
আজি মোর কুসুমের মাস—দুই কর্ণে পশিতেছে
যৌবন-কবির কাব্য-ম্লানমন্দ উচ্চ রুলতান।
কালসিন্ধু-কলোচ্ছ্বাসে এ যৌবন যেন শেষ হয়,
পিতা, মোরে কর আশীর্বাদ।

যযাতি। আশীর্বাদ করি বৎস; দীর্ঘ হোক যৌবন তোমার—
যেমন যামিনী দীর্ঘ, সূর্যহীন শীর্ণ মেরুদেশে।
যে শিক্ষা নীরব-নম্র অন্তরের গাঢ় বেদনায়
আপনারে করে উৎসর্জন, সে শিক্ষা লভনি তুমি,
চিনিয়াছ শুধু আপনারে, সেই কেন্দ্রে করি ভর
জীবনের পূর্ণ জ্যোতি কতদিন রাখিবে ধরিয়া?
কে তুমি? তুর্বসু বুঝি! এসো বৎস মোর পাশে

তোমার নয়নে আজি করি পাঠ ভাগ্যলিপি মোর!
পুত্র, এক ভিক্ষা আছে।

তুর্বসু। হে রাজন, ভিক্ষা মোর কাছে? মনে হয় উপহাস
করিতেছ পদানত সন্তানের সাথে। তুমি রাজা,
সসাগরা ধরণীর একজন তুমি অধীশ্বর—
দীনতম দাস আমি—ভিক্ষা দিব কি শক্তি আমার?

যযাতি। উপহাস নহে ওরে জীবনের করুণ প্রার্থনা
তুমি মোর আত্মার প্রকাশ তাই তুমি প্রিয় মোর।
যেথা তুমি এবে হের উদ্ভাসিত উজ্জ্বল আলোকে
সেথা তুমি কেহ নহ মোর। যেথা তুমি চলিয়াছ
আমার কামনা অনুসরি, তীব্র আত্ম-নিপীড়নে
সঙ্কুচিয়া বাসনা তোমার, সেথা তুমি প্রিয়তম
আত্মজ আমার। বার্ধক্যের শুভ্র মেঘে ছেয়ে গেল
মোর নীলাকাশ—মোর স্বপ্ন। একমাত্র তুমি আছ
আপন হৃদয়াবেগে ঝঞ্ঝাসম তুমি দুর্নিবার,
একমাত্র তুমি পারো মোর যত বৈক্লব্য নাশিতে,
মাতা তব দেবযানী, অকুণ্ঠিত তার আত্মদান
তব দেহ-ধমনীতে অনুক্ষণ ফিরিছে সঞ্চারি—
জাগো বৎস, তুলি লও ব্যাধি-জীর্ণ এই জরাভার,
আর মোরে দান করো প্রেমফুল্ল অমেয় যৌবন।

তুর্বসু। তোমার প্রার্থনা পিতা, ধিক্কারের শল্য হানে প্রাণে।
আত্মঘাতী ভিক্ষা তব, নিদারুণ নিয়তির মতো
সন্তান-রুধিরশোষী,—লুব্ধ জিহ্ব ক্রুর সরীসৃপ
সযত্নে লালন কর বার্ধক্যের শুভ্র ছদ্মবেশে।
ঈর্ষা করো সন্তানেরে, ঈর্ষা করো জীবন তাহার।
নারী-দেহ-লালসায় আজিও কি হয় নাই শেষ?
নগ্ন প্রকৃতির চোখে আজিও কি পড়েনি নিমেষ
তোমার নির্লজ্জ ক্ষুধা হেরি? হে নৃপতি আজীবন
লক্ষ নারীদেহ লয়ে করিয়াছ কন্দুকের ক্রীড়া
সন্দীপিত কামানলে নিশিদিন দিয়েছ ইন্ধন!
কি আশ্চর্য, আজো তার এই পরিণাম কোন্ সুখে
হে ভূপাল, আমি দিব যৌবন আমার? কোন দুখে
তুলি লব তব জরা, অসুর-গুরুর অভিশাপ?
তার চেয়ে বলো আমি ত্যাগ করি এই পাপ-পুরী

নিঃশব্দে ভাসিয়া যাই গর্জমান এই বিশ্ব-স্রোতে,
রাজ্যলোভ নাহি মোর নাহি লোভ জীবন-শৃঙ্খলে,
নাহি লোভ শাসনের তর্জনী-হেলনে। মোর প্রাণ
একটি কুসুম-সম সমর্পিব দেবতার পায়ে।

যযাতি। তাই যাও, বৎস, তাই, ভেসে যাও তব বিশ্বস্রোতে,
উত্তাল জীবন তব শান্ত হোক্ তারি আকর্ষণে,
পৃথিবীরে চেনো নাই—মুগ্ধ স্বচ্ছ ভাবনার বেগে
মনে কর বিশ্বস্রোত তব সম সরল উদার!
পাপেরে জেনেছ পাপ, পুণ্যে পুণ্য বলি চিনিয়াছ—
একদা দেখিতে পাবে পাপ-পুণ্য দুই একাকার
বিশ্বস্রোতে চলিয়াছে সমধর্মী দুই সহোদর
জীবনের অভিযান-পথে। সেদিন চিনিবি মোরে—
সেইদিন বাক্য তব হইবে মসৃণ-স্নেহাতুর।
সেইদিন রূঢ় সত্য করিবে গোপন। তাই যাও
বৎসে তাই ভেসে যাও অসঙ্কোচে তব বিশ্বস্রোতে।
হোথা কে দাঁড়ায়ে আছ, বীর দ্রুহ্য, তনয় আমার?
প্রিয়তম, জরাভারে দৃষ্টি মোর হয়েছে মলিন,
এসো কাছে, যযাতির শোকশল্য কর উন্মোচন,
শূরশ্রেষ্ঠ শর্মিষ্ঠার প্রথম সন্তান!

দ্রুহ্য। পিতা, কিবা অভিলাষ তব?

যযাতি। শর্মিষ্ঠা-তনয় তুমি, তোরে হেরি মোর চিত্ত-তলে
গভীর করুণা-উৎস অশ্রুবেগে উচ্ছিছে উথলি,
অবহেলা ঘৃণা আর দীনতার পুঞ্জীভূত ভার
সবলে ধুলায় ফেলি উদিয়াছ ভাস্বর-কুমার,
দীর্ঘ শাল-প্রাংশু বাহু—সমুন্নত উজ্জ্বল ললাট,
বীর তুমি, জননীর গোপন গৌরব। বৎস আজ
দেখ চেয়ে পিতা তব প্রাণহীন জড়ত্বের ভারে,
সর্ব শক্তি হয়েছে নিশ্চল—কঠিন তুষারে যথা
মহাগিরি-নির্ঝরের গতি অবসান। বীর তুমি,
দূর করো অন্ধকার দূর করো জরারাহুগ্রাস—
তার আগে এসো কাছে, এসো বৎস কহি কানে-কানে,
সেই দীর্ঘ অন্ধকার তুমি নিজে করিবে বরণ,
তব শৌর্য তব প্রেম, তব শক্তি প্রদানিবে মোরে!

দ্রুহ্য। পিতা একি সুকঠিন প্রার্থনা তোমার?
শ্রেয়ঃ মোর মরণ-আশ্রয়। বুঝি না কি অভিপ্রায়ে
ভিক্ষা করো তনয়-যৌবন? মোরা তব যোগ্য পুত্র,
রোগ দুঃখে রণে, শোকে মোরা তব শক্তির আধার
আমরা-ই তব বাহুবল। কহ মোরে শত্রু কেহ
এসেছে কি পুরদ্বার-পথে, অথবা সীমান্তে পিতা
ঘটেছে কি বলহানি, আকস্মিক বিদ্রোহ-বিপ্লব?
অথবা দংশিছে প্রাণে কোনো দুঃখ কোনো অপমান—
কহ মোরে, দাও গো আদেশ, দেখ দ্রুহ্য কত বল
ধরিয়াছে বাহুতে তাহার! বক্ষ-কারা-মাঝে মোর
নিরন্তর উদ্বেলিত ধরিত্রীর জয়-তৃষ্ণা-রস—
সেই মোর প্রাণ-শক্তি, সেই মোর দুর্বার যৌবন,
তারে তুমি করো না প্রার্থনা। দীর্ঘ জরা-অন্ধকার
এ জীবনে পারি না বহিতে। জানে দ্রুহ্য তার চেয়ে
শ্রেয়ঃ হবে মরণ-আশ্রয়।

যযাতি। তাই হোক, যৌবন অটুট হোক—আশা সীমাহীন
তব বক্ষে করুক বিরাজ। কিন্তু জেনো একদিন
জয়-তৃষ্ণা শেষ হবে, অন্য রূপ ধরিবে পিপাসা,
সেদিন স্মরিও মোরে—লোলদৃষ্টি যযাতিরে স্মরি
তনয়-সকাশে কভু চাহিও না যৌবন তাহার।
হে বিধাতা, এরা চাহে ধরিত্রীর পূর্ণ অধিকার,
চাহিল না কোনোজন দীনতম পিতার হৃদয়,
তবু এরা জয়ী হবে! হায়-হায়, মিথ্যা এ কামনা—
তবু, তবু একবার শেষবার পাত্র পূর্ণ করি
ভোগ-আয়তনা মহীসুরাসম ওষ্ঠে ধরিবার
জেগেছে দুর্লভ আশা। দ্বারপ্রান্তে কে তুমি দাঁড়ায়ে—
ক্ষীণদেহ অনু বুঝি? শর্মিষ্ঠার মধ্যম তনয়,
মোর মহাযজ্ঞে তুমি কি আহুতি করিবে প্রদান?

অনু। বলো পিতা যাহা ইচ্ছা তব, বাসনা তোমার জানি,
আর জানি আপন সত্তায়। হে রাজন্, মোর ধর্ম
শুধু উপভোগ—প্রজাপতি-বৃত্তি মোর-গড়িয়াছি
নিজ তন্ত্র, সেথা আমি রাজ-রাজেশ্বর। মোর স্বর্গে
নিশিদিন উৎসারিছে কামনার গান। নাহি সূর্য,
নাহি চন্দ্র—একবাণী ঝঙ্কারিত নিত্য মধুমাসে!
ক্ষীণদেহ অনু তব গড়িয়াছে আপন ভুবন

এই তার মহা-অহঙ্কার। আমার জন্মের আগে
যে বাসনা সঞ্চারিত তৃপ্তিহীন তব বক্ষোমাঝে
যে বাসনা গুঞ্জরিত জননীর তনুদেহমাঝে
নিকুঞ্জের বাসক-শয়নে, যে গোপন সার্থকতা
অন্ধকার তরুচ্ছায়ে লুব্ধ নেত্রে সন্ধানিত পথ,
মোর দেহ—তাঁরি রূপ-রাগ, মূর্তিমান তব ক্ষুধা—
ধরিয়াছি ক্ষীণদেহ—শশাঙ্কের অভিশপ্ত বেশ।
তাই পিতা, জরা তব মোর দৃষ্টি পারে না সহিতে,
তাই পিতা, জরা মোর দুঃস্বপ্ন দারুণ। ক্ষমা করো,
ভুলে যাও অনুরে তোমার। এ প্রদীপ নিবে যাবে
কস্তুরী-কুঙ্কুম-গন্ধে, যুবতীর সুরভি-নিঃশ্বাসে।

যযাতি। নির্বাপিত হেরো আজি জীবনের সর্বদীপমালা,
সর্ব জ্বালা শান্ত হোক, জাগো-জাগো হে-কালরূপিণী
একটি শিখায় জ্বলো হে সৃষ্টির আদিভূত কান,
জীর্ণ বাসনার রূপ আর আমি পারি না হেরিতে।
যে দীপালি জ্বালায়েছি, বিশ্বধ্বংসী তোমার নিঃশ্বাসে
হোক তার দীপ্তি অবসান। চিতাভস্মে জাগো রতি
নিখিলের আনন্দ-লহরী—বৃদ্ধ যযাতির অশ্রু
যতনে মুছাও। তব স্পর্শে শেষ হোক স্বয়ম্বর
আসন্ন মৃত্যুর। জাগো-জাগো নির্ঝর-রূপিণী তুমি—
সপ্ত-স্বর্গ বিশ্বসম লুপ্ত হবে তোমারি প্রবাহে
একা রব ঊর্ধ্বশির—লীলাময়ী, মোর সহস্রারে
মধু-বিন্দু-সম্ভোগের শেষে জাগিবে নূতন করি—
জাগে যথা বনস্পতি মধুমাসে নূতন পল্লবে।
মুছে যাবে জায়া-পুত্র, মুছে যাবে ঋতু-বর্ষ-মাস,
তুমি রবে, আর হবে নূতন সৃজন—লক্ষ-লক্ষ
দুঃখের কুসুমে। নিবে যাক্, জীবনের দীপমালা
আজি নিবে যাক্! অলিন্দের স্তম্ভতটে কে হোথায়
রয়েছ দাঁড়ায়ে? পাংশু মুখ, চিন্তাতপ্ত সুকুমার
ললাটের পারে কাকপক্ষ গুচ্ছকেশ নামিয়াছে
মেঘাঞ্জন-সম—শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠতনয়-পুরু?
তোরে আমি ডাকিব না কাছে, আর মোর সাধ নাই
শুনিবারে শেলসম পুত্রের বচন। কাছে আয়,
আয় পাশে ;—বেদনায় অশ্রুদান, সে-ও সুদুর্লভ।

পুরু।

শুধু অশ্রুদান নহে, কোন্ দান চাহে যে বিধাতা
আজো তার হল না উদ্দেশ। স্বহস্তে গড়িয়া তোলে,
শাখায়-পল্লবে আর ফুলে-ফলে বিচিত্র জীবন,
তারপরে একদিন ঝঞ্ঝাবেগে গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে
সাড়া জাগে কাল-বৈশাখীর। বিনাশের ভেরিধ্বনি,
শুনিতেছি আমি নিশিদিন—দেখিতেছি কালো মেঘ,
পরক্ষণে উল্কাবেগে ঘূর্ণিধূলি উঠিছে আকাশে,
মহারাজ্য, রাজসভা, যোদ্ধৃবেশী সেনানী-মণ্ডল,
বিজয়-আরাব আর অরাতির করুণ রোদন
এক লক্ষ্যে শেষ হয়, মিলে আসি মরণ-আহ্বানে।
কতদিন পশিয়াছি মহারণ্যে কিশোর বয়সে
দীর্ঘ বিটপীর দেহ পর্বতের উচ্চ চূড়াসম
মেদিনীর মেরুদণ্ড-মাঝে তার ঘন অন্ধকার
নিঃস্পন্দ শাখায় আর নিগূঢ় পল্লবতলে
শুনিয়াছি কতদিন অদৃশ্য সে ছায়া-শরীরীর
আর্ত রোদনের রব—শুনিয়াছি নিঃশব্দ সঙ্কেত,
শুনিয়াছি কহিতেছ—"হে কুমার, সব শেষ হবে
দেহ যাবে, যাবে প্রেম, শেষ হবে বিজয়-উল্লাস
মর্ত্য-মানবের স্বপ্ন শেষ হবে কঠিন কঙ্কালে,
শুধু ছায়া সত্য জেনো, বহু যুগ-যুগান্তর পারে
জন্ম-মৃত্যুহীন দেশে এ বিদেহী কার বিচরণ,
বিদ্যুৎ-চকিত শূন্য একা জাগে পরিণামহীন।"
পিতা, আমি শুনিয়াছি পল্লবের প্রচ্ছন্ন আঁধারে
অদ্ভুত হাসির ধ্বনি-দিক্ হতে ছুটে দিগন্তরে,
অমনি নামায়ে নেত্র দুইহাতে ঢাকিয়াছি মুখ,
কহিয়াছি, "নহে-নহে, যা কহিলে সত্য কভু নহে,
মোর প্রেম সীমাহীন বেদনায় লভেছে জনম,
হে বিদেহী মিথ্যা সবি, মোর প্রেম—সে কি সত্য নয়?"
বাহিরে এসেছি ছুটে, অরণ্যের গাঢ় অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে মহাকাশ। অরণ্যের ঘন অন্ধকার
পশ্চাতে এসেছে ছুটে, সুগভীর আর্ত দীর্ঘশ্বাস
শুনিয়াছি পার্শ্বে মোর—শুনিয়াছি করুণ রোদন।
তারপরে গেছে দিন,—আজ যেন তব পুরীমাঝে
বলভির ছায়া-পাশে. অলিন্দের স্তম্ভ-রেখামূলে
গৃহ-বাতায়ন-কোণে পারাবত-কূজনের মাঝে
সহসা শুনিনু আমি পরিচিত স্ফুটকণ্ঠস্বরে,

কারা যেন কহিতেছে—"হে কুমার, সব শেষ হবে,
দেহ যাবে, যাবে প্রেম, শেষ হবে বিজয়-উল্লাস।
মর্ত্য-মানবের স্বপ্ন শেষ হবে কঠিন কঙ্কালে।
শুধু ছায়া সত্য জেনো, বহু যুগ-যুগান্তর-পারে
জন্ম-মৃত্যুহীন দেশে এ বিদেহী করে বিচরণ,
বিদ্যুৎ-চকিত শূন্য একা জাগে পরিণাম-হীন।"
তাই পিতা পাংশুমুখে ভাবিতেছি প্রদোষ-তিমিরে
আমার হৃদয়-মাঝে যে প্রশান্তি করিছে বিরাজ
যে গভীর প্রেমে আমি চিনিয়াছি বিশ্ব-চরাচর
প্রফুল্ল পদ্মের মতো সেই প্রেম—সে কি সত্য নয়?
সেই তো শেখালো মোরে, দেহ যায় প্রেম অমলিন
তাপ-তপ্ত ধরা আর মনে প্রেম শীতল নির্ঝর,
নিত্য শুদ্ধ সেই প্রেম—কহ পিতা, সে কি সত্য নয়?
এখনো নীরব তুমি? —জরাজীর্ণ কপোলের 'পরে
নামিছে তরল অশ্রু! মোর বাণী প্রলাপের মতো
পশিছে কি কর্ণে তব? তব ভালে সুস্পষ্ট রেখায়
লেখা আছে জীবনের প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের স্বাক্ষর—
তোমারো নয়নে অশ্রু? জরা-দুঃখে দহিছে হৃদয়?
কিশোর পুরুর মতো বনে-বনে চাহিছ ঘুরিতে,
মুক্তকণ্ঠে গাহি গান প্রসারিত প্রান্তরের 'পরে,
আস্বাদিয়া বন-ফল, লভি ঘ্রাণ বন-কুসুমের
চঞ্চল মৃগের প্রাণ বহিতে কি আজো সাধ যায়?
আমারে কহিল অনু, 'পিতা চাহে যৌবন তোমার,
তোমারে কহিবে নিতে জীর্ণ জরা সহস্র বর্ষের।—
কহ পিতা, সত্য একি? অশ্রুদান কেন সুদুর্লভ
কহিলে তখন? শোনো পিতা, শিখায়েছে মোরে প্রেম
বিনাশের পথ রুধি প্রসারিতে প্রাণ-পারাবার
অজস্র মুক্তির পথে, মোহ-ডোর ছিন্ন করে পিতা,
শিখিয়াছি প্রাণ-পদ্ম দিতে উপহার—অশ্রু নহে,
দিতে পারে কাবোষ্ণ রুধির, যদি তাহে আসে শান্তি
হৃদয়ে তোমার। মোরে করিয়াছ দান সুকুমার
সুন্দর শরীর—সেই ঋণে ঋণী আমি চিরদিন
চরণে তোমার—মোর প্রাণ সে তো শুধু ঝঙ্কারিত
দেহ-যন্ত্র-গান—আত্মা সে তো সর্বভূতময়। পিতা,
তুমি দিবে জরা—সেতো শুধু দেহ-আবরণ। পিতা,
তুমি লবে তুলি যৌবন আমার দুঃখ নাই তাহে!

শিখিয়াছি ভোগে নাই চরম-আস্বাদ। শিখিয়াছি—
কামানল চির অনির্বাণ—নূতন কামনা তাহে
হোমানলে আহুতি শমান। প্রসরিয়া হস্তদুটি
পিতা, মোরে কর আশীর্বাদ, সেই সাথে এসো তুমি
শীত-শুভ্র চাঞ্চল্য নাশন-এসো তুমি হিমালয়
তুষার-কীরিটী, গঙ্গা-নীর উদ্বেলিয়া জটাতলে
স্তব্ধ করি দাও মোর চেতনা-শরীর! যাও তুমি
সে মুহূর্তে বিগলিত কাঞ্চন-বরণ, মোহময়
উন্মদ যৌবন—স্থবিরের শিরামাঝে ভরি দাও
সুরাসম উত্তপ্ত শোণিত, যাও তুমি প্রিয়তম
কিশোর পুরুর গান কণ্ঠ হতে লয়ে যাও চলে
প্রবাহিয়া দাও তারে পিতৃদেহমাঝে দীর্ঘদিন
কালস্রোতে ভেসে যাবে নির্মাল্যের মতো। শুধু রবে
আত্মদান—শুধু রবে মোর প্রেম চির অচঞ্চল।

(রচনাকাল। ১১ই বৈশাখ, ১৩৪১)

জলাঙ্গী

স্রোতের আবৃত্তিগুঞ্জন শুনতে পাই
কাপড় কাচার শব্দ
হাঁসের পাখাঝাড়ার শব্দ
জলযন্ত্রের নিত্য আবর্তমান ঝম-ঝম শব্দ
মনে হয়, নদী চলেছে এঁকেবেঁকে
আমার মনের নদী
কাশফুলে ভরে গেছে তার দুই তীর
কৃষাণেরা কাজ করছে ক্ষেতে
বধূরা সারি বেঁধে চলেছে পথে
সে আমার জলাঙ্গী।

(রচনাকাল। ১৩৪১)

মনের শিথিল ভাবনাগুলি

মনের শিথিল ভাবনাগুলি
আশ্বিনের শিথিলবৃন্ত শেফালির মতো,
শ্যামলদূর্বার ওপর ঝরে পড়তে চায়।
শিশিরে ঝলমল শ্যামলদূর্বা
আর অস্নাত টলমল রূপসায়র।
ইচ্ছা করে সারাদিন কান পেতে থাকি
এই বিচিত্র জগতের বিচিত্র ধ্বনিঝঙ্কারের দিকে,
শব্দের পর শব্দ কথার পর কথা—
আর তরল গলিতস্বর্ণ প্রভাতরৌদ্রের দিকে চেয়ে থাকি
সারাদিন সারাদিন।

(রচনাকাল। ১৩৪১)

একটি ছোট পতঙ্গ

কোথায় একটি ছোট পতঙ্গ বাসা বাঁধছে
জামগাছের শুকনো কাঠের ভিতরে
তার সেই ক্লান্তিহীন কর্মের তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ এসে লাগছে
আমার মস্তিকের স্নায়ুকেন্দ্রে
অপরূপ শরৎপ্রভাতে সেই শব্দ আমার কত ভালোই না লাগছে।
ছোট্ট একটি পাখি বারে বারে ডাকছে—কুক্‌লি-কুক্‌লি
মনে হয়, এই উপেক্ষিত আবেষ্টনীর মধ্যে
সঞ্চিত হয়ে আছে চিরযুগের মধু
তা আমাদের কর্মক্লান্ত দৃষ্টির নেপথ্যে।

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

ভাঙা কোঠাবাড়ি

অনেকদিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি
কাঁঠাল আম নারকেলের বাগান
তার ফাঁকে-ফাঁকে দেখি
একটি মেয়েকে

শ্যামল বনশোভার মতো
মনের পীড়া যে দূর করে
এমন মেয়ে।

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

চেয়ে চেয়ে দেখি

কতদিন চেয়ে দেখি
চোখে রঙের নেশা লাগে—
বর্ষার ভরা নদী, কাশফুল,
মাঝে-মাঝে এক-একখানি নৌকো ভেসে চলেছে,
গাঁয়ের লোকগুলি চলেছে নিঃশব্দে
দেখি আর মনে হয়—
এ যেন পৃথিবীর অর্ধাবগুণ্ঠিত রহস্যময় মুখ
নেপথ্যে চলেছে অযুত আয়োজন
এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার জন্য।

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

বর্ষার দিনে

বর্ষার দিনে গঙ্গার তটরেখায়-রেখায়
চলেছে আমার মন।
বাবলাগাছের হরিদ্রাভ ফুল—
অসংখ্য পাখির একতান ঝঙ্কার
শালিখ পাখির মেলা—
এই শ্যামল শোভার মধ্যেও
হৃদয়ের কান্না থামে না কিছুতেই।

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

বড় সুন্দর এই পৃথিবী

বড় সুন্দর এই পৃথিবী
সাধ যায় এই
অপরূপ সবুজ শোভার মধ্যে
বেঁচে থাকি কিছুকাল।
শুধু দেখি আর স্বপ্নের মায়াভুবন
রচনা করি
অগণন মুহূর্তের ফাঁকে-ফাঁকে।

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

ছুটি

মনে হয় যেন ছুটি পেয়েছি
সমস্ত চিরাচরিত মানব-পন্থা থেকে
মুক্তি পেয়েছি আমার মনে।
ভিতরের মানুষটাকে কে জানে?
সে শুধু বীণা বাজায় আর গান গায়
আর উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে
যেখানে শ্যামল বনের অন্তরালে
ভীরু কাঠবিড়ালী ত্বরিত-গতিতে
যাওয়া-আসা করে নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ!

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

প্রচ্ছন্না

এক এক সময় অনুভব করি
পৃথিবীর বক্ষবিদারণ যে স্বত-উৎসারিত রসধারা,
আমি যেন তারই প্রান্তরেখায় বিস্মিতদৃষ্টি বালকের মতো বসে আছি।
চিরকাল যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে
আমার সেই মুহূর্ত দর্শনের কাছে।

মনে মনে বলি,
হে প্রচ্ছন্না, তোমার গুণ্ঠন আর অপসারিত করো না
অত প্রখরতা সইব কি করে?

(আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪৬)

মনগহনী

(অংশ)

বনে আর ইটমাঠকোঠার মধ্যে
থাকতেন মধুপিসিমা।
আর তেঁতুল ফুলে ভরা
নিমনিষিন্দের বনে
পোড়ো ভিটে
তিত্‌কি নালিমের ক্ষেতে
থাকতেন আর একজন।

পথে যেতে যেতে
যেন বাঁশি শুনি
কোন সে দিনের বাঁশি।
আর কুমড়ো বনে
বাগবাগিচার ধারে
কাঁকুড় ক্ষেতে
আর এমনি যেতে যেতে পেতে পেতে
চলেছি। .....
চলা আর গান গাওয়া.....
এখন নালিমের ক্ষেতের রাঙাকর্তামার কথা।
ভিজে ঠাণ্ডা তামাকপোড়ার গন্ধে ভরা
মাঠকোঠা ঘরে থাকতেন রাঙাকর্তামা।
তাঁর ওখানে পড়তাম চণ্ডীদাসের পদাবলী,
জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

বকুলবনের পথে
সেদিনের বাঁশি বাজে।
রাঙাকর্তামার ঘরে
কী যেন গন্ধ ভরে,

কী যেন আলো আসে
সিক্ত দিনের মনকুসুমের
সুরভিত নিঃশ্বাসে।
বকুলবনের মধ্য দিয়ে
রাধা যাবেন গোপন অভিসারে
কুশ নদীর ধারে।
নন্দ বললেন শ্রীরাধাকে
'গহনী মনগহনী থেকে
শ্রীকৃষ্ণকে আনো
তাঁকে জানো।
বনে-বনে ঘুরে-ঘুরে দূরে-দূরে
যেন হারিয়ে ফেলো না আপনাকে।'

* * *

মুড়াগাছা স্টেশনের পাশে উত্তরে যেতে বামদিকে
একটা বাড়ি দেখেছিলাম ছোটতে
তাতে কত লোকজন আর ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে,
সামনেটা ফুলের বাগান
বাতাবি নেবুফুলের গাছ,
কামিনীফুলের গাছ
আর মেহেদির ঝোপ।
আর একটি ছোট সাদা গেট
সন্ধ্যার অন্ধকারে কিংবা সকালে ট্রেনে যেতে-যেতে
বাড়িটি বেশ লাগত দেখতে।
অনেক দিন পর আবার সেই পথ দিয়ে যাই,
দেখি বাড়িটি নেই, ভেঙে চুরে গেছে।
লোকজন নেই, গেট ভাঙা।
গরু-ছাগল ঢুকে বাগান নষ্ট করে দিয়েছে,
রেলিং পড়েছে ভেঙে।
ট্রেনে যেতে-যেতে মনে হয়, কোথায় গেল তারা
যারা এখানে ছিল?

* *

উদাস প্রান্তর ধূ-ধূ—
ঘন অন্ধকারে
ট্রেনে যেতে-যেতে বাঁ দিকে তাকালে
আর-একটা রক্তাভ ভাঙা বাড়ি

তার উপরটা যেন গম্বুজাকার।
নির্জন অন্ধকারে কিসের যেন ভয়।
হয়তো প্রেতলোকবাসিনীরা তার মধ্যে ঘুরছে
মাঝে-মাঝে তাদের দীর্ঘশ্বাস বন-বনানীকে কাঁপিয়ে তুলছে যেন।
মনে হয় এক নিঃসীম মহাসুদূরতা গঙ্গা-জলাঙ্গীর
বালুতটকিনারে গিয়ে মিশেছে।

* *

আলোকিত দালানে রক্তকমল ধূপগুগগূল,
কুশাসনে পুরুত পূজোয় বসেছেন,
মন্ত্রোচ্চারণে মহাকালীর আরতি হচ্ছে।
....বলির জন্যে কাঁপছে ছাগশিশু!
উৎসর্গ হয়ে যাওয়ার পর
শাণিত খড়্গ দেখানো হচ্ছে তাকে....
তারপর শোনা গেল ছাগশিশু মুক্তি পেয়েছে।

(একালের কবিতা। বিষ্ণু দে-সম্পাদিত। ভাদ্র ১৩৬৯)

প্রেমিক

যদিও বন্ধুরা আছে,
আর আছে সুন্দরী প্রেয়সী
সবার উপরে তবু আছে আর কেহ,
আমি তারি প্রতীক্ষায় আছি।

কোমল প্লামের ফুল ফুটিবে যখন,
পাখিদের গানে হবে বাতাস চঞ্চল,
আকাশে ভাসিবে সুখ, মৃদুল আরাম—
সে তখনো আসিবে না।

সে আসিবে সুবিপুল কলরোল হতে,—
তারার রহস্য-জ্যোতি চারিপাশে নিয়ে,
পুঞ্জ-পুঞ্জ ধূম-কুণ্ডলীতে
আবরিবে ধাবমান অশ্বগুলি তার।
অকস্মাৎ নত হয়ে সে আমারে জড়ায়ে ধরিবে—
আমারে ব্যাকুল করি ভীষণ সে বাহুর বন্ধনে
আমারে করিবে বিদ্ধ একটি চুমায়।
তীব্র তারা জ্বালা হতে
ধীরে-ধীরে ওষ্ঠ বাহি ঝরিবে রুধির।

উন্মত্ত আনন্দ-ভরে সে আমারে করিবে আঘাত,
তারপরে যতনে মুছায়ে আঁখি,
ওষ্ঠ হতে রক্ত মুছি লয়ে
আমারে সে ঘিরে লবে স্বপ্নহীন প্রসুপ্তির মাঝে
চিরকাল ওরে।

(রিচার্ড অ্যাল্‌ডিংটন)

সমাপ্তি

বেশি কথা বলেছি কি প্রেম নিয়ে?
অথবা কিছুই মোর বলা হয় নাই,—
কে পারে বলিতে?

কিন্তু মোরা ঢুলিনাকো মিথ্যার নেশায়—
জানি কত সুগভীর বেদনারে নিয়ে
আমরা পেয়েছি শুধু জীবনের আলো আর সুখ
সীমাহীন অন্ধকার শূন্যতার তীরে!
হেথা মোরা ক্ষণকাল দেখি সূর্য,
উচ্চ পাহাড়ের ক্ষেতে আঙুর-দ্রাক্ষার গুচ্ছ ধীরে করি ঘ্রাণ,
কাঁদি, গাই, যুদ্ধ করি—ভোগে কিংবা উপবাসে দিন বহে যায়-
সুতীব্র মধুর ওষ্ঠ, মসৃণ কোমল স্তন স্পর্শ করি,
আর ভালোবাসি।

আর, মর্ত্যজীবনের এই ক্ষুদ্র আলোবিন্দুমাঝে,
হিমশীত দীর্ঘ কক্ষে, মৃদু ক্ষীণ বর্তিকার মতো
মোরা জানি প্রেমে আছে স্বচ্ছতম আলোর বিকাশ—
জানি, যবে ওষ্ঠে বহি সর্বোত্তম জীবন-রুধির
আমরা চুম্বন করি, মোরা বসি মহেন্দ্রের পাশে
মহা-মহিমায়!

(রিচার্ড অ্যাল্‌ডিংটন)

মধ্যপথে

স্তব্ধ হয়ে থাকে প্রেম ক্ষণকাল তরে,
কামনার যত জন্মদাহ—সব যবে শান্ত হয়ে আসে।

আমি থাকি প্রতীক্ষায়,
আমি দুলি দিবসের ফেণময় তরঙ্গ-চূড়ায়—
সমুদ্রের দেবতার মতো।
দীর্ঘ বক্র শ্মশ্রু বাহি যার বিন্দু-বিন্দু ঝরে বারিকণা,
কঠিন মসৃণ দেহ,—ঊর্মিশীর্ষ হতে
যে দেখে সুদূর ফেনপুঞ্জরেখা-পারে

নগ্না যুবতীর তনু,—
অমনি প্রাণের মোহ নিঃশেষে ভুলিয়া
ক্ষণ-বাসনায় দীপ্ত ছুটে চলে তার অভিমুখে।

সে গতির বিরতিতে তবু আমি রহি যে বাঁচিয়া!
সেই মহাজলভার দোলে যবে লক্ষ-লক্ষ ফেনার কুসুমে,
চূর্ণ করে দেহ মোর, নিঃশেষে রক্তাক্ত করি ফেলি দেয়
তার ছুটি সুশীতল ক্ষুদ্র পদতলে,
সে প্রচণ্ড শ্বাসরোধী সাগরের সংক্ষোভ-শয়নে,
ঊর্মি-ছুরিকার সেই সুতীক্ষ্ণ আঘাতে,
তবু সুখী হব,
যদি মোর ক্লান্ত দেহ টানি লয়ে নিবিড়-বন্ধনে,
আমার মুখের 'পরে, আমার চোখের 'পরে, আর মোর কপোলের পাশে
যদি সে কহিয়া যায় প্রণয়ের অশ্রান্ত প্রলাপ,—
মূঢ় করি দিয়া যায় কম্পমান বক্ষের স্পন্দন—
এতটুকু স্পর্শে যার আমার ধমনীগুলি চঞ্চলিয়া উঠে!

(রিচার্ড অ্যালডিংটন)

ভূমিকা

সাধ হয় আরো বেশি ভালোবাসিবার!
যে চিরসুন্দরে আমি এতদিন বাসিয়াছি ভালো,
তারে ভুলে যেতে পারি,
তোমার গভীর প্রেম যদি আমি পারি চিনে নিতে।
হায়, হেথা প্রেমিকের কত ক্ষুদ্র দানের পরিধি,—
কিন্তু আমি দিতে পারি মোর দেহ—যত শক্তি মোর,
আর আমি দিতে পারি জীবনের তুচ্ছ দিনগুলি
আর দিতে পারি ভাষা—অনুরাগ-বেদনা-আতুর,
যে ভাষা গুঞ্জবে নর-নারীদের কপোল-ছায়ায়
সৃষ্টির প্রথম দিন হতে।

আমি যে ভাবিতে চাই একটি সে দান,—
কেহ যারে পায় নাই সারা ধরণীতে ;
আমি ভাবি : যদি ওই শান্ত স্থির দেবতার দল,
সহিত প্রেমের তাপ আমার মতন,

তারা কি তোমারে দিতে পারেনাকো একটি তারকা?
যে তারা তোমার দেহে জ্বালি দিবে যৌবন-অনল, চিরস্থায়ী!
আমি যা পারি না দিতে, তারা কি তা দিতে পারিত না?

দেবতারে কেন তুমি ভালোবাস নাই? আমি ধূলিকণা—
তবু জানি, কখনও এত ভালোবাসেনি দেবতা,—
যত ভালোবাসে তোমা এই দীন ব্যর্থ ধূলিকণা!

(রিচার্ড অ্যালডিংটন)

প্রতিধ্বনি

'কে ডাকে?—কহিনু আমি, সেই শব্দ দুটি
গুঞ্জিত বনের ফাঁকে
সচকিল পাখিদের—হেথা-হোথা ছুটি'
'কে ডাকে? কে ডাকে?'

ঊর্ধ্ব হতে শাখা পত্রময়
রৌদ্রে যেন কী কহিল কথা!
আঁধার বাতাস বনময়
সেই শব্দ বহিল কোথায়!

সবুজে, ছায়ায় চোখগুলি
গতিহীন তটিনীর তীরে!
অনুকারে যেন কেহ, আমি যাহা বলি
উপহাস ভাসিল সমীরে।

চিৎকারি কহিনু আমি,—'কি বা আসে-যায়?'
বায়ু স্তব্ধ হল, আর অশ্রু-বিদ্ধ সুর!
সে নির্জনে 'হায়-হায় কিবা আসে যায়!'
কাঁদিয়া ঘুরিল যেন দূর হতে দূর!

(ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার)

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৩১১ বঙ্গাব্দের (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) আশ্বিন মাসে মহালয়ার দিন নদীয়া জেলার গোকুলনগর গ্রামে হেমচন্দ্র বাগচীর জন্ম। পিতা রাখালদাস বাগচী জমিদারি-সেরেস্তায় চাকরি করতেন। মাতা নীলাব্জবরণী দাসী।

শৈশব ও শিক্ষা : পিতার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। গোকুলনগর গ্রামের পাঠশালায় বাল্যকালে হেমচন্দ্রের হাতেখড়ি। পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। অন্যমনস্ক ও ভাবুক-প্রকৃতির ছিলেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থাতেই তাঁর প্রথম কবিতা 'তৃষিতা' স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে পিতা কর্মসূত্রে বদলি হওয়ায় কিছুদিন ক্যানিং-এ ছিলেন। কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজে আই.এস. সি. ও বি.এস. সি. পড়লেও কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯২৩ সালে বি.এ. পাস করেন। ১৯২৪ সালে বিশেষ-সাম্মানিক (Special Hons) সহ স্নাতক হন। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় এম.এ. পাস করেন।

বিবাহ : ১৯২৪ সালে বালির ভোলানাথ সান্যালের কন্যা সুবোধিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁদের পাঁচটি পুত্র যথাক্রমে— অমল, প্রবীর, সমীর, সুধীর ও শিশির। তিনকন্যা হলেন : সবিতা (মনু), অন্তু ও ঝন্টু।

কর্মজীবন : ভবানীপুর পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। এরই মধ্যে তিনি বি.টি. পাস করেন। ১৯৪১ সালে আরো দু-একটি কলেজে (মালদা আদিনা কলেজ তাদের অন্যতম) অধ্যাপনার পর রাজসাহী গভর্ণমেন্ট কলেজে স্থায়ী অধ্যাপক হন। কিন্তু মাত্র তিনমাস সেখানে ছিলেন। এরপর আর্থিক কারণে কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে 'বাগচী

অ্যান্ড সন্স' প্রকাশন সংস্থা গড়ে তুলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে নিজের সম্পাদনায় করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শতনরী' (১৯৩০), জগদীশ গুপ্তের গল্প সংকলন ও তাঁর নিজের গল্প-সংকলন 'মায়াপ্রদীপ' উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগরে ঘূর্ণীর নিজ বাড়িতে 'বৈশ্বানর' পত্রিকা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশ করেন ও ঘূর্ণিতেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা খোলেন।

সাহিত্য-সাধনা : কাব্যগ্রন্থ : 'দীপান্বিতা' (১৩৩৫); 'তীর্থপথে' (১৩৩৯); 'মানসবিরহ' (১৩৪৫); তপনকুমারের অভিযান (ছোটোদের বই) 'মায়াপ্রদীপ' (ছোটোদের গল্প-সংকলন), 'অনির্বাণ' (উপন্যাস)। এছাড়া তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

তাদের অধিকাংশই গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। তাঁর অসংখ্য সংস্কৃত ও ইংরেজি কবিতা বাংলায় অনূদিত রয়েছে। ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার, রিচার্ড আলডিংটন, আইজার রোজেনবার্গ, আর্নেস্ট ডসন-প্রমুখ কবিদের বহু কবিতা তিনিও বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

স্বীকৃতি : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থে তাঁর কবিতা 'দুরাশা' স্থান পায়। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থে ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাঙলা কবিতা' গ্রন্থে তাঁর কবিতাগুচ্ছ স্থান পায়।

মৃত্যু : শেষজীবনে কবি মানসিক ভারসাম্য হারান। ১৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিল, গোকুলপুরের নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কবির দেহান্ত ঘটে।

বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট প্রতিভা মায়াপ্রদীপ, মানসলোকে দীপশিখা জ্বালিয়ে বহু তীর্থপথ অতিক্রম করে প্রায় অবহেলিত থেকে নির্বাপিত হল।